শ্রমণ

ISSN: 0975-8550

।। ২৬তম বর্ষ ।। শ্রাবণ ১৪৩০ ।। ১ম সংখ্যা ।।

শ্রমণ ॥ শ্রাবণ ১৪৩০ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥

ISSN : 0975-8550

সূচীপত্র

1.	মহিমাপুরের কসৌটি মন্দির	ডঃ লতা বোথরা	1
2.	আগম পাঠ : ভগবতীসূত্র	শ্রীকান্ত জৈন	2
3.	মহাবীর স্বামী; ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক প্রতিস্রোতগামী চরিত্র	শর্মিষ্ঠা চক্রবর্ত্তী	9
4.	আদি তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের তাৎপর্য	তানিম নওশাদ	16
5.	ভারতের মহীয়সী; সুলসা শ্রাবিকা	সুখময় মাজী	19
6.	শ্রাবকচরিতকথা: পুণিয়া শ্রাবক	জয়শ্রী লাহা	23
7.	জৈন ধর্ম: সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার এক জীবনপ্রণালী	রজত সুরাণা	27

সম্পাদক

ডঃ লতা বোথরা

সহ-সম্পাদক

সুখময় মাজী

॥ जैन भवन ॥

প্রকাশক

জৈন ভবন

পি-25, কলাকার স্ট্রীট, কোলকাতা -700007

মহিমাপুরের কসৌটি মন্দির

- ডঃ লতা বোথরা

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগৎশেঠ পরিবার দ্বারা নির্মিত মুর্শিদাবাদের মহিমাপুরের কসৌটি প্রস্তর দ্বারা নির্মিত জৈনমন্দির একদা একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। শেঠ হীরানন্দ শাহ'জী নাগৌর থেকে আগ্রা, পাটনা, ইত্যাদি স্থানে ব্যাপারের জন্য এসেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর উত্তরসূরীদের প্রভাব প্রতিপত্তি মুঘল দরবারে, মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে, এমনকি ইংরাজ সরকারেও বেশ ভালো রকম ছিল। এঁদের মর্যাদা ও গরিমা কোন রাজা বাদশা'র থেকে কিছু কম ছিল না। সারাদেশে এঁরা অনেক কুঠি গড়ে তুলেছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এঁদের অবদান ছিল বিশাল। শাশ্বত তীর্থ সম্মেৎ শিখর তীর্থক্ষেত্রের উন্নয়নেও এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এঁদের আভিজাত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক রাজা মহারাজা, এমনকি দিল্লীর বাদশাহ পর্যন্ত তাঁদের সম্মান করতেন। ধীরে ধীরে কালান্তরের গহ্বরে এই পরিবারের পতন শুরু হয়েছিল, ইংরাজদের দ্বারা প্রতারণার শিকার হওয়ার মধ্য দিয়ে। ঐ সময়ই ভাগীরথীর ভাঙ্গনের কারণে কোটি-কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির লোকসান ঘটে; গঙ্গা ভাগীরথী তটে দুর্লভ কসৌটি প্রস্তরে নির্মিত জিনালয়টিও গঙ্গাতীরের ভাঙনের ফলে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। তখন শেঠ উদয়চাঁদ ভগবানের প্রতিমাগুলিকে ঐ মন্দির থেকে উদ্ধার করে তাঁর মহিমাপুরের কুঠিতে নিয়ে গিয়ে নতুন এক জৈন মন্দির নির্মাণ করে সেখানে ঐ প্রতিমাগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন মন্দির বানানোর কাজে তিনি ঐ ভগ্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলিকেও কাজে লাগিয়েছিলেন।

ইতিহাসের কোনও এক অন্ধকার সময়ে শুধুমাত্র ধর্ম রক্ষা করার জন্য যখন বঙ্গদেশ থেকে জৈনদের বিতাড়িত হতে হয়েছিল, তখন তারা নিজেদের সাথে করে তাঁদের আরাধ্য জৈন প্রতিমাগুলিকেও নিয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি যে সব স্থানে তারা নতুন করে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই সব স্থানে এই তীর্থঙ্কর প্রতিমাগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠিক তেমনই, যখন জগৎশেঠের উত্তরপুরুষরা মন্দিরের ঠিকমতো দেখাশোনা করায় অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন শ্রদ্ধেয় আচার্যপ্রবর শ্রী পদ্মসাগর সূরীশ্বর মহারাজ সাহেবের প্রেরণায় আহমেদাবাদের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী শ্রী মুকেশ ভাই শাহ এই মন্দিরকে গান্ধীনগরের বোরিজ নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে আচার্যশ্রীর নিশ্রায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আজ মহিমাপুরের জগৎ শেঠের কসৌটি পাথরের এই জিনালয় বোরিজস্থিত বিশ্বমৈত্রী ধামে নিজের গৌরবময় অতীত বুকে নিয়ে বিশ্বমানবকে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে প্রেরণা দিচ্ছে।

আগম পাঠ : ভগবতীসূত্র

- শ্রীকান্ত জৈন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরপর দ্বিতীয় সূত্রে বিষয়সূচী বর্ণিত হয়েছে।

রায়গিহ চলণ দুক্খেকংখপওসে য পগতি পুঢবীও।
জাবংতেনেরইয় বালে গুরুএ য চলণাও।।২।।

-:শব্দশঃ অর্থ:-

রায়গিহ (রাজগৃহ নগর) চলণ (চলন) দুক্খে (দুঃখ) কংখপওসে (কাঙ্ক্ষা-প্রদোষ) য (এবং) পগতি (প্রকৃতি অর্থাৎ কর্মপ্রকৃতি) পুঢবীও (পৃথিবীসমূহ)। জাবংতে (যাবৎ অর্থাৎ যতটা দূর থেকে) নেরইয় (নৈরয়িক) বালে (বালক) গুরুএ (গুরুক) য (এবং) চলণাও (চলনাদি)।

-:সরলার্থ:-

রাজগৃহ নগরে চলন-বিষয়ক প্রশ্ন, দুঃখ, কাঙ্ক্ষা-প্রদোষ, কর্ম-প্রকৃতি, পৃথিবীসমূহ, যাবৎ অর্থাৎ দূরত্ব, নারকী, বালক, গুরুক, এবং চলন (এই শাস্ত্রের প্রথম উদ্দেশকে আলোচিত হয়েছে)।

অর্থাৎ প্রথম দশ উদ্দেশকের বিষয়ক্রম এই সূত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলির নাম পাঠকের কাছে অপিরিচিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথাস্থানে এগুলির পরিচয় দেওয়া হবে।

তৃতীয় সূত্রে মাত্র দুটি শব্দ রয়েছে –

"নমো সুয়স্স"।।৩।।

অর্থাৎ নমঃ শ্রুতস্য; এর অর্থ **দ্বাদশ অঙ্গ বিশিষ্ট শ্রুত শাস্ত্রকে প্রণাম।** আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, ইত্যাদি বারোটি শাস্ত্রে অর্হন্ত ভগবানের বাণী সংকলন করা হয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি অঙ্গ বলা হয়। বারটি অঙ্গকে একত্রে বলা হয় 'শ্রুত'। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নমঃ শব্দযোগে সংস্কৃত ভাষার মতোই প্রাকৃত ভাষাতেও চতুর্থী বিভক্তি হয়; কিন্তু প্রাকৃতে চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ অভিন্ন। এই গাথাটির সংস্কৃত রূপ হবে নমঃ শ্রুতায়।

প্রথম তিনটি গাথার মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ করার পর শাস্ত্রকার চতুর্থ গাথা থেকে মূল আলোচ্য বিষয়সমূহে প্রবেশ করেছেন। অতঃপর আর খুব বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই এরপর থেকে শুধুমাত্র মূল গাথা, প্রয়োজনে এর সংস্কৃত রূপ এবং তার বাংলা অনুবাদই রাখার চেষ্টা করা হবে। আবশ্যকতা অনুসারে অনুবাদকের নিজস্ব মন্তব্য বা মতামতও দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম উদ্দেশ্যক : প্রস্তাবনা বা আরম্ভ।

(সূত্র ৪/১)

তেণং কালেণং তেণং সময়েণং রায়গিহে নামং নয়রে হোত্থা। বণ্ণও। তস্স ণং রায়গিহস্স নয়রস্স বহিয়া উত্তরপুরত্থিমে দিসীভাগে গুণসিলয়ে নামং চেইএ হোত্থা।

-:শব্দশঃ অর্থ:-

তেণং কালেণং (সেই কালে) তেণং সময়েণং (সেই সময়ে) রায়গিহে (রাজগৃহী) নামং (নামক) নয়রে (নগর) হোত্থা (ছিল)। বণ্ণও (বর্ণকঃ)। তস্স ণং রায়গিহস্স নয়রস্স (সেই রাজগৃহ নগরের) বহিয়া (বাইরে) উত্তরপুরত্থিমে (উত্তর-পূর্ব) দিসীভাগে (দিক্ ভাগে) গুণসিলয়ে (গুণশীলক) নামং (নামক) চেইএ (চৈত্য) হোত্থা (ছিল)।

-:সরলার্থ:-

সেই কালে সেই সময়ে রাজগৃহী নামক একটি নগর ছিল। সেই রাজগৃহ নগরের বাইরে উত্তর-পূর্ব দিকে গুণশীলক নামে একটি চৈত্য ছিল।

'সেই কালে' এবং 'সেই সময়ে' শব্দবন্ধ দুটি আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক। তাই এই গাথা পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট বলে পাঠকের মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে 'কাল' এবং 'সময়' ভিন্নার্থক। কালের ক্ষুদ্রতর এক অংশকে সময় বলা হয়েছে। কাল বলতে জৈন কালচক্রের ধারণা অনুযায়ী অবসর্পিণী কালকে বোঝানো হয়েছে। এবং সেই অবসর্পিণী কালের অন্তর্গত কোনও এক কালখণ্ডকে 'সময়' বলা হয়েছে। এখানে 'ণং' শব্দটি কোনও অর্থ ছাড়াই কেবলমাত্র বাক্যালঙ্কার অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; অনেকটা সংস্কৃত 'খলু' শব্দের ন্যায়।

'বর্ণক' শব্দটি আলাদাভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এই শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে রাজগৃহ নগরের বর্ণন ঔপপাতিক সূত্রে বর্ণিত চম্পা নগরীর বর্ণনার সমান বলে ধরে নিতে হবে। চৈত্য বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি, এখানে 'চৈত্য' শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যন্তরগৃহ বা ভুতুড়ে বাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গাথা থেকে বোঝা যায় যে রাজগৃহ নগর 'রাজগৃহী' নামেও পরিচিত ছিল।

(সূত্র ৪/২)

তেণং কালেণং তেণং সময়েণং সমণে ভগবং মহাবীরে আইগরে তিত্থগরে সহসংবুদ্ধে পুরিসুত্তমে পুরিসসীহে পুরিসবরপুংডরীএ পুরিসবরগংধহত্থী লোগনাহে লোগপ্পদীপে লোগপজ্জোয়গরে অভয়দয়েচক্খুদয়ে মগ্গদয়ে সরণদয়ে ধম্মদেসয়ে ধম্মসারহী ধম্মবরচাউরংতচক্কবট্ঠী অপ্পডিহয়বর নাণদংসণধরে বিয়ট্টছউমে জিণে জাবএ বুদ্ধে বোহয়ে মুত্তে মোয়এ সব্বণ্ণু সব্বদরিসী সিবময়লমরুজমণংত্মক্খয়মমব্বাবাহং সিদ্ধিগতি নামধেয়ং ঠাণং সংপাবিউকামে জাব সমোসরণং।

পরিসা নিগ্গয়য়া। ধম্মো কহিও। পরিসা পডিগয়া। (৪/২)

-:শব্দশঃ অর্থ:-

তেণং কালেণং তেণং সময়েণং সমণে (শ্রমণ) ভগবং (ভগবান) মহাবীরে (মহাবীর) আইগরে (আদিকর; দ্বাদশাঙ্গী শ্রুতশাস্ত্রের আদি স্রষ্টা) তিত্থগরে (তীর্থংকর; যিনি সাধু-সাধ্বী-শ্রাবক-শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ তীর্থ স্থাপন করেন) সহসংবুদ্ধে (স্বয়ং সম্বুদ্ধ; যিনি নিজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন) পুরিসুত্তমে (পুরুষোত্তম) পুরিসসীহে (পুরুষসিংহ) পুরিস-বর-পুংডরীএ (পুরুষশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীক; পুণ্ডরীক যেমন ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি যিনি পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) পুরিসবরগংধহত্থী (পুরুষশ্রেষ্ঠ গন্ধহস্তী) লোগনাহে (লোকনাথ' 'লোক' শব্দের অর্থ ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধঃ - এই তিন লোক) লোগপ্পদীপে (লোকপ্রদীপ) লোগপজ্জোয়গরে (লোক-প্রদ্যোতকর; ত্রিলোক যার আভায় উজ্জ্বল হয়) অভয়দয়ে (অভয়দাতা) চক্খুদয়ে (চক্ষুদাতা; শ্রুতধর্ম রূপ চক্ষু যিনি দান করেন) মগ্গদয়ে (মার্গদাতা; পথ প্রদর্শক) সরণদয়ে (শরণদাতা) ধম্মদেসয়ে (ধর্মদেশক; ধর্মের উপদেশক) ধম্মসারহী (ধর্ম-সারথি; ধর্মরূপ রথের যিনি সারথি) ধম্মবরচাউরংতচক্কবট্ঠী (ধর্মবর-চাতুরন্ত চক্রবর্তী; ধর্মচক্রধারী শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী অথবা শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্রধারী চক্রবর্তী) অপ্পডিহয়বর (অপ্রতিহত-বর) নাণদংসণধরে (জ্ঞান ও দর্শন ধারী) বিয়ট্টছউমে (ছদ্মরহিত; ছলকপট থেকে মুক্ত) জিণে

(জিন) জাবএ (জ্ঞায়ক) বুদ্ধে (বুদ্ধ; সর্বজ্ঞ) বোহয়ে (বোধক; অন্যদের যিনি তত্ত্ববোধ দান করেন) মুত্তে (মুক্ত) মোয়এ (মোচক; মুক্তিদাতা) সব্বণ্ণু (সর্বজ্ঞ) সব্বদরিসী (সর্বদর্শী) সিবময়লমরুজমণংত্মক্খয়মব্বাবাহং (শিবম্-অচলম্-অরুজম্-অনন্তম্-অক্ষয়ম্- সিদ্ধিগতি-অব্যবাধম্; যিনি শুভ, অচল, রোগরহিত, অনন্ত, অক্ষয়, সিদ্ধিগতি প্রাপ্ত এবং সর্বপ্রকার বাধা থেকে মুক্ত) নামধেয়ং (নামধেয়) ঠাণং (স্থান) সংপাবিউ (সম্প্রাপ্তির জন্য) কামে (কামনাকারী; ইচ্ছুক) জাব (জাবৎ) সমোসরণং (সমবশরণ)।

পরিসা (পরিষদ্) নিগ্গয়া (নির্গত হল)। ধম্মো কহিও (ভগবানের দ্বারা ধর্মোপদেশ কথিত হল)। পরিসা (পরিষদ্) পডিগয়া (প্রতিগত; ফিরে গেল)।

-:সরলার্থ:-

দ্বাদশাঙ্গীরূপ শ্রুতশাস্ত্রের আদি কর্তা, তীর্থংকর, যিনি কারো সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন, যিনি পুরুষদের মধ্য শ্রেষ্ঠ, সিংহের ন্যায় পরাক্রমী, পুণ্ডরীক বা শ্বেতকমলের ন্যায় নির্মল, গন্ধহস্তীর ন্যায় শক্তিশালী এবং বিশাল, ত্রিলোকের মধ্যে সর্বোত্তম, ত্রিলোকের প্রভু, যিনি দীপের ন্যায় ত্রিলোককে প্রকাশিত করেন, ধর্মের উপদেশক, জীবকে শ্রুতধর্ম রূপ চক্ষু যিনি দান করেন, যিনি জীবকে সত্যধর্মের পথ দেখান, যিনি সকল জীবের শরণ, বিশ্ব সংসার যাঁর আভায় উজ্জ্বল হয়, ধর্মরূপ রথের যিনি সারথি, যিনি ধর্মচক্রধারী শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ এবং অপ্রতিহত জ্ঞান ও দর্শনের অধিকারী, সমস্ত রকম মায়া বা কপটতা থেকে মুক্ত, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞাতা, যিনি সমস্ত বোধের অধিকারী এবং বোধ প্রদানকারী, সমস্ত রকম বাহ্য এবং আভ্যন্তর পরিগ্রহ থেকে যিনি মুক্ত, যিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বজীবের মুক্তিদাতা, যিনি শুভ, অচল, নীরোগ, অনন্ত, অক্ষয়, এবং সর্বপ্রকার বাধা থেকে মুক্ত পুনর্জন্মবিহীন সিদ্ধগিতি অর্থাৎ মোক্ষস্থান লাভে ইচ্ছুক, সেই শ্রমণ ভগবান মহাবীর স্বামী সেই অবসর্পিণী কালের সেই সময়ে বিচরণ করছিলেন।

ভগবান মহাবীর নগরে পদার্পণ করেছেন জেনে পরিষদ অর্থাৎ রাজা এবং তাঁর দলবল ভগবানের দর্শন, বন্দন এবং পূজন করার জন্য ও তাঁর নিকট থেকে ধর্মোপদেশ লাভের জন্য পথে বেরিয়ে এলেন। ভগবান তাঁদের ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্মোপদেশ লাভ করে এবং যথাশক্তি ধর্মধারণ করে সবাই নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভগবান মহাবীরের বর্ণনা দেওয়ার সময় তাঁর সম্বন্ধে প্রচুর বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো অনুচ্ছেদটাই ভগবানের বিশেষণে পূর্ণ। অথচ ভগবানের ধর্মোপদেশ দানের বিষয়টি শুধুমাত্র একটি

ছোট্ট বাক্যে সেরে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভগবানের ধর্মোপদেশ প্রদানের বিষয়ে পরে বিস্তৃত বর্ণনা পাব। সম্ভবতঃ সেই কারণেই এখানে অতি সংক্ষেপে বিষয়টি শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

(সূত্র ৪/৩)

তেণং কালেণং তেণং সময়েণং সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স যেট্ঠ অংতেবাসী ইংদভূতী নামং অনগারে গোয়ম গোত্তে ণং সত্তুস্সেহে সমচউরস্সসংঠাণসংঠিএ বজ্জরিসভনারায়সংঘয়ণে কণগপুলগণিঘসপম্হগোরে উগ্গতবে দিত্ততবে তত্ততবে মহাতবে ওরালে ঘোরে ঘোরগুণে ঘোরতবস্সী ঘোরবংভচেরবাসী অচ্ছুঢ়সরীরে সংখিত্তবিপুললেয়লেসে চউদসপুব্বী চউনাণবগএ সব্বক্খর- সন্নিবাতী সমণস্স ভগবতো মহাবীরস্স অদূরসামংতে উড্ঢং জাণু অহোসিরে ঝাণকোট্ঠোবগএ সংজমেণং তবসা অপ্পাণং ভাবেমাণে বিহরই। (৪/৩)

-:শব্দশঃ অর্থ:-

তেণং কালেণং তেণং সময়েণং সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স (শ্রমণ ভগবান মহাবীরের) জেট্ঠ (জ্যেষ্ঠ) অংতেবাসী (শিষ্য) ইংদভূতী (ইন্দ্রভূতি) নামং (নামক) অনগারে (অনগার অর্থাৎ সাধু) গোয়ম (গৌতম) গোত্তে (গোত্র) ণং সত্তুস্সেহে (সপ্তহস্ত প্রমাণ) সমচউরস্সসংঠাণসংঠিএ (সমচতুরস্র সংস্থানে সংস্থিত) বজ্জরিসভনারায়সংঘয়ণে (বজ্রনারাচ সংহনন বিশিষ্ট) কণগ (কনক অর্থাৎ স্বর্ণ) পুলগ (পুলক) ণিঘস (নিকষ বা কষ্টিপাথররের দ্বারা সোনার গায়ে অঙ্কিত দাগ) পম্হ (পদ্মের কেশরের সমান) গোরে (গোরা অর্থাৎ ফর্সা) উগ্গতবে (উগ্রতপা) দিত্ততবে (দীপ্ততপা) তত্ততবে (তপ্ততপা) মহাতবে (মহাতপা) ওরালে (উদার) ঘোরে (পরিষহ বিজয়ের ক্ষেত্রে কঠোর) ঘোরগুণে (অন্যের পক্ষে দুশ্চর মূলগুণধারী) ঘোরতবস্সী (ঘোর তপস্বী) ঘোরবংভচেরবাসী (কঠোর ব্রহ্মচর্যবাসী) অচ্ছুঢসরীরে (শরীর-সংস্কার ত্যাগী) সংখিত্ত (সংক্ষিপ্ত) বিপুল (ব্যাপক) তেয়লেসে (তেজোলেশ্যা*) চউদসপুব্বী (চতুর্দশ পূর্ব ধারী) চউনাণবগএ (চতুর্জ্ঞান সম্পন্ন) সব্বক্খর-সন্নিবাতী (সর্ব-অক্ষর-সন্নিপাতী) সমণস্স ভগবতো মহাবীরস্স (শ্রমণ ভগবান মহাবীরের) অদূরসামংতে (বেশি দূরেও নয়, বেশি নিকটেও নয়) উড্ঢং জাণু (ঊর্ধ্বজানু) অহোসিরে (অধোশিরে) ঝাণ (ধ্যান) কোট্ঠোবগএ (কোষ্ঠে উপগত) সংজমেণং (সংযম দ্বারা) তবসা (তপস্যার দ্বারা) অপ্পাণং (আত্মাকে) ভাবেমাণে (ভাবমান অবস্থায়) বিহরই (বিহার করেন; বিহার করছিলেন)।

-:সরলার্থ:-

সেই অবসর্পিণী কালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের অনতিদূরে ঊর্ধ্বজানু এবং অধোশির হয়ে অর্থাৎ উৎকুটাসনে আসীন হয়ে ধ্যানরূপ কোষ্ঠে প্রবিষ্ট শ্রমণ ভগবান মহাবীরের জ্যেষ্ঠ শিষ্য ইন্দ্রভূতি নামক অনগার অর্থাৎ সাধু সংযম এবং তপের দ্বারা নিজ আত্মাকে ভাবিত করতে করতে বিহার করছিলেন। তিনি গৌতম গোত্রসম্ভূত ছিলেন। সাত হাত উঁচু সমচতুরস্র সংস্থান এবং বজ্রনারাচ সংহননের অধিকারী ছিল তাঁর দেহ। কষ্টিপাথর দিয়ে সোনার গায়ে টানা দাগ যেমন উজ্জ্বল, পদ্মের কেশর যেমন গৌর বর্ণ, তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল তেমনি উজ্জ্বল ও গৌর। তিনি ছিলেন উগ্রতপা, দীপ্ততপা, তপ্ততপা, মহাতপা, উদার, পরিষহের বিরুদ্ধে কঠোর, দুশ্চর মূলগুণধারী, কঠোর তপস্বী, কঠোরভাবে ব্রহ্মচারী এবং শরীর-সংস্কার ত্যাগী। তিনি বিপুল তেজোলেশ্যাকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিলেন; অর্থাৎ নিজের শরীরের মধ্যে অনায়াসে অন্তর্লীন করে নিয়েছিলেন। তিনি চতুর্দশ পূর্বের জ্ঞাতা ছিলেন এবং চার প্রকার জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; সমস্ত অক্ষর একত্রে তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল।

এখানে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার, মনে হয়। বিষয়গুলি হল - সমচতুরস্র সংস্থান, বজ্রনারাচ সংহনন, পরিষহ, তেজোলেশ্যা, চতুর্দশ পূর্ব এবং চার প্রকার জ্ঞান।

সংস্থান শব্দের অর্থ আকৃতি। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল, ইত্যাদি আকারকেও সংস্থান বলা হয়। জৈন ধর্মে শরীরের আকৃতিকে সংস্থান বলা হয়। সংস্থান ছয় রকমের হতে পারে। যথা – সমচতুরস্রশরীর সংস্থান, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলশরীর সংস্থান, সাদিশরীর (বা স্বাতিশরীর) সংস্থান, কুব্জশরীর সংস্থান, বামনশরীর সংস্থান এবং হুণ্ডকশরীর সংস্থান। তীর্থংকর ভগবান সর্বদা সমচতুরস্র সংস্থানবিশিষ্ট শরীরে অধিকারী হন।সমচতুরস্র শব্দটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত – সম অর্থাৎ সমান, চতুঃ অর্থাৎ চার এবং অস্র অর্থাৎ কোণ। পদ্মাসন অথবা সুখাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় যে মানুষের সামুদ্রিক শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণবিশিষ্ট শরীরের চার কোণের (ডান হাঁটু থেকে বাম কাঁধ, ডান হাঁটু থেকে বাম হাঁটু, বাম হাঁটু থেকে ডান কাঁধ এবং আসন থেকে কপাল) দূরত্ব সমান হয়, সেই অঙ্গসংস্থানকে সমচতুরস্র সংস্থান বলা হয়।

সংহনন বা সংহয়ন শব্দের অর্থ অস্থিসংস্থান। বজ্র শব্দের অর্থ কীলক বা পেরেক, ঋষভ শব্দের অর্থ বেষ্টনপট্টি এবং নারাচ শব্দের অর্থ উভয় দিক থেকে পরস্পরকে বেড় দিয়ে আটকে থাকা। যে অস্থিসংস্থানে দুই হাড় দুই দিক থেকে পরস্পরকে বেড় দিয়ে আবদ্ধ থাকে এবং সেই

আবদ্ধ অংশের উপর তৃতীয় একটি বেষ্টনপট্টির আকারের হাড় চারদিক থেকে সেই হাড়দুটিকে বেষ্টন করে রাখে, তদুপরি বজ্র নামক কীলকাকৃতি এক হাড় এই তিনটি হাড়কেই গেঁথে রাখে, সেই অস্থিসংস্থানকে বজ্রঋষভনারাচ সংহনন বলে। অরিহন্ত, চক্রবর্তী, ইত্যাদি মহাপুরুষদের শরীরে এই সংহনন থাকে।

সাধক যখন সাধনার পথে এগিয়ে চলেণ তখন কোনোভাবেই যাতে তিনি সাধনপথ থেকে বিচ্যুত না হন, সেই উদ্দেশ্যে এবং কর্মক্ষয় করার উদ্দেশ্যে তাঁকে যে সব বাধাগুলি সমতার ভাব নিয়ে সহ্য করতে হয়, সেই বাধাগুলিকেই পরিষহ বলে। পরি উপসর্গের দুই প্রকার অর্থ এখানে ধরা যেতে পারে – সব দিক থেকে অথবা সম্যকভাবে। সহ্ ধাতুর অর্থ সহন করা বা সহ্য করা। তাই পরিষহ হল চতুর্দিক থেকে আসা বাধাসমূহ, যাদের সম্যকরূপে সহন করতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, দংসমশক, নগ্নতা, অরতি, স্ত্রী, চর্যা, নিষধা, শয্যা, আক্রোশ, বোধ, যাচনা, অলাভ, তৃণস্পর্শ, মল, সৎকার-পুরষ্কার, প্রজ্ঞা, অজ্ঞান, এবং অদর্শন –এই বাইশ প্রকার পরিষহের মধ্যে একসাথে সর্বাধিক উনিশটি পরিষহ একজন সাধককে সহ্য করতে হতে পারে।

তেজোলেশ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে লেশ্যা বিষয়টি একটু জানা দরকার। ‘লেশ্যা’ একটি জৈন পারিভাষিক শব্দ, যার অর্থ হল, মনোবৃত্তি, মনোভাব, মানসিক স্তর বা মনের অবস্থাবিশেষ। যে মনোভাব বা মনোবৃত্তি আত্মাকে কর্মে লিপ্ত করে, বা যার দ্বারা আত্মা কর্মে লিপ্ত হওয়ার ফলে কর্মবন্ধন ঘটে, তাঁকে লেশ্যা বলা হয়। লেশ্যা মোট ছয় প্রকার – কৃষ্ণলেশ্যা, নীললেশ্যা, কাপোতলেশ্যা, পীতলেশ্যা, পদ্মলেশ্যা এবং শুক্ললেশ্যা। প্রথম তিন লেশ্যা অশুভ এবং শেষ তিন লেশ্যা শুভ। চতুর্থ লেশ্যা কাপোতলেশ্যারই অপর নাম তেজোলেশ্যা। তেজোলেশ্যার অধিকারী ব্যক্তি সরলস্বভাব, নম্র, অকপট, ধার্মিক, নিরাকাঙ্ক্ষ, বিনীত এবং পাপভীরু হন। তিনি প্রতিটি কাজে বিবেকরূপ চক্ষুর ব্যবহার করেন। নিজের শক্তিকে তিনি অকারণ প্রয়োগ করেন না। তাঁর মনে অপরের কল্যাণের চিন্তা থাকে। তিনি প্রিয়, দৃঢ়ধর্মী এবং পরহিতৈষী হন। এরূপ ব্যক্তি একমাত্র তখনই কারো অহিত করার কথা ভাবেন, যখন সেই অহিতের দ্বারা অন্য কারো অহিততর কাজকে প্রতিহত করা যায়। (ক্রমশঃ)

মহাবীর স্বামী; ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক প্রতিস্রোতগামী চরিত্র

- শর্মিষ্ঠা চক্রবর্ত্তী

এম.এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত),(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.ফিল. (প্রথম), (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
গবেষক (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

জৈনধর্ম সামগ্রিকভাবে কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তির নয় বরং অনেকের দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিহাস উপস্থাপন করে। তথাপি এখানে প্রধানতঃ উল্লেখ্য বিষয় মহাবীর স্বামীর জীবন বৃত্তান্ত। জৈন ধর্মের চব্বিশ নম্বর তীর্থঙ্কর তথা সর্বশেষ ধর্ম প্রবক্তা হলেন মহাবীর স্বামী।

বৈশালী নগরের 'নাত' (মতান্তরে 'নাগ') গোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত জৈন ধর্মের অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী 'মহাবীর' নামে খ্যাত ছিলেন না। জৈন ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর সমসাময়িক কালে নিগণ্ঠনাত-পুত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর নাম 'বেশালিএ' বা 'বৈশালীয়'-ও ইতিহাসে উল্লেখ আছে—যা তাঁর জন্মস্থানকে চিহ্নিত করে। আটটি ছোট ছোট গোষ্ঠী বা রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল বৈশালী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তির কারণে বৈশালী নগর তথা মহাবীরের জন্মস্থান চ্যুত হয়। হয়তো বা কিছুটা সেই কারণেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য মহাবীর স্বামী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্য ও লিচ্ছবী এই দুই জাতীয় ক্ষত্রিয় রাজারা শিক্ষায় ও জ্ঞানে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এমনকি পূর্বে অনেক ব্রাহ্মণ বিদেহ দেশের ক্ষত্রিয়দের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিদেহ দেশই ছিল লিচ্ছবী ক্ষত্রিয় রাজাদের 'বৈশালী'(অধুনা পাটনার সাতাশ মাইল উত্তরে বেসাঢ়)। লিচ্ছবীদের জ্ঞাতিরা 'নায়' বা 'নাত' নামে পরিচিত হতেন। সেযুগে রাজার 'জ্ঞাতি' বোঝাতে 'নায়' বা 'নাত' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। 'নাত' বা 'নায়' শব্দ দুটি সংস্কৃত জ্ঞাতৃ বা জ্ঞাত শব্দ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই রকমই এক প্রতিপত্তিশালী নায় বংশের ভূস্বামী হলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর পত্নী হলেন ত্রিশলা। ভৌমিক সিদ্ধার্থ বাস করতেন বৈশালীর অন্তর্গত কুন্ডনগরে। ৫৯৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে সর্ব শুভযোগ সমন্বিত দিনে মধ্যরাত্রে সিদ্ধার্থ পত্নী ত্রিশলা জন্ম দেন সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত পুত্র সন্তানের, যার নাম বর্ধমান। এই বর্ধমানই হলেন জৈন ধর্মের চব্বিশ নম্বর তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী।

শ্রমন ভগবান মহাবীর স্বামীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে জৈন ধর্মের শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বিশ্ব কালচক্রের প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জীবকে কৃপা করেছেন। মহাবীর স্বামী হলেন অবসর্পিণীর অর্থাৎ বর্তমান অধোগামী

কালপর্যায়ের শেষ তীর্থঙ্কর। তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি হল : বর্ণ- স্বর্ণালী, প্রতীক-সিংহ, বৃক্ষ-শাল। এই বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ই একই মত পোষণ করে। শ্রমন মহাবীরের প্রতি অচলা ভক্তির সহিত শ্বেতাম্বরগণ এই কাহিনী বিশ্বাস করেন যে মহাবীর স্বামীকে পূর্বজন্মকৃত কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয়ের জন্য দেবী ত্রিশলার পূর্বে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে দেবী দেবানন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হয়। দেবানন্দার কুক্ষিতে প্রবেশের পর তাঁর অশুভ কর্মের ফলভোগের অবসান ঘটলে তিনি উচ্চকূলের ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভের গর্ভান্তরিত হন। এই কাহিনীকে দিগম্বরগণ মান্যতা দেন না। মথুরায় প্রাপ্ত খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ভাস্কর্য শিল্পে মহাবীর স্বামীর গর্ভান্তর প্রাপ্তির চিত্র খোদিত আছে।

মহাবীর স্বামীর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, মাতা ত্রিশলা চোদ্দটি শুভ স্বপ্ন দেখেছিলেন। একথা উল্লেখ্য যে, কোন তীর্থঙ্কর বা চক্রবর্তী নারী-গর্ভে আবির্ভূত হলে সেই তীর্থঙ্কর বা চক্রবর্তীর মাতা এইরূপ স্বপ্ন দেখেন যা জ্যোতিষাচার্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা জৈন নারীগণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহিত এই স্বপ্নগুলির আবৃত্তি করেন। রৌপ্যে খোদিত স্বপ্নমূর্তিগুলি বিভিন্ন জৈন মন্দিরে সংরক্ষিত করা হয়।

শ্রমন ভগবান মহাবীরের জন্মগ্রহণে শুধু সিদ্ধার্থের গৃহেই নয়, সমগ্র কুন্ডনগরে আনন্দ্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই আনন্দ্যোৎসবে যেমন স্বর্গবাসী দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন তেমনি মর্ত্যলোকের সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষও উপস্থিত ছিলেন। নবজাতকের জন্মের পর থেকে দ্বাদশ দিন পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বাদশ দিনে নবজাতকের পিতা-মাতা নবজাতকের নামকরণ করেন—বর্ধমান। দেবতারা নবজাতকের নানা গুণ দেখে নামকরণ করেন 'শ্রমন ভগবান মহাবীর'। এমনই কাহিনী মহাবীর স্বামী সম্পর্কে প্রচলিত আছে। এই ভাবেই সৌম্যকান্তি বর্ধমান বেড়ে উঠতে থাকেন; শৈশব পেরিয়ে যৌবনে প্রবেশ করেন এবং বেদ সহ নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। জৈনগণের মধ্যে মহাবীর স্বামীর বাল্যকাল এবং যৌবনকালের অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে।

মহাবীর স্বামীর বিবাহ সম্পর্কেও জৈন ধর্মের দুই শাখার মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। দিগম্বরগণ মনে করেন যে মহাবীর স্বামীর বিবাহ হয়নি। কিন্তু শ্বেতাম্বর শাস্ত্রানুসারে কাশ্যপ গোত্রীয় বর্ধমানের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল কৌন্ডীন্য গোত্রীয়া যশোদার সহিত। তাঁহাদের অনবদ্যা মতান্তরে প্রিয়দর্শনা নামে একটি কন্যাসন্তান ছিল। তাঁর কন্যা ক্ষত্রিয় জমালিকে বিবাহ করেন, যিনি প্রথমে মহাবীর স্বামীর অনুগামী হলেও পরবর্তীকালে মহাবীর স্বামীরই বিরোধিতা করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য সংসার ত্যাগ করার প্রবল ইচ্ছা বর্ধমানের বাল্যকাল থেকেই ছিল। তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমে সন্তানের এরূপ ইচ্ছাতে পিতা-মাতার অনুমতি ছিল না।

পরবর্তীকালে তাঁরা অনুমতি প্রদান করলেও বর্ধমান তাঁর পিতামাতার জীবদ্দশাতে সংসার পরিত্যাগ করেননি। পিতা-মাতা বিয়োগের এক বছর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দীবর্ধন, পত্নী যশোদা, ভগিনী ইত্যাদি সকলের সম্মতি গ্রহনের পর ত্রিশ বছর বয়সে শুভদিনে কুণ্ডনগরের বহির্ভাগে ষণ্ডবন নামক উপবনের অশোক বৃক্ষমূলে উপনীত হলেন। তথায় সর্বগৃহী আলম্বন ত্যাগ করে মুণ্ডিত-মস্তকে, নিরম্বু-ষষ্ঠ-ভক্ত ব্রত পালনের দ্বারা অনাগারিত্ব গ্রহণ করলেন। জৈন মতে পাঁচটি জ্ঞানকে স্বীকার করা হয়। সেগুলি হল মতি-জ্ঞান, শ্রুত-জ্ঞান, অবধি-জ্ঞান, মনঃপর্যায়-জ্ঞান ও কেবল-জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব। মহাবীর স্বামী সম্পর্কে এ কথার উল্লেখ আছে যে তিনি মতি-জ্ঞান, শ্রুত-জ্ঞান, অবধি-জ্ঞান, এই তিন প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জৈন শাস্ত্রানুসারে তীর্থঙ্কর সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে তাঁরা জন্মগতভাবে উক্ত তিনটি জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। অনাগারিত্ব গ্রহণের পরই তিনি মনঃপর্যায়-জ্ঞানের অধিকারী হন। জৈন শাস্ত্রানুসারে কেবল-জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব লাভ দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করে। তপস্যা ও সাধনার দ্বারাই মনঃপর্যায়-জ্ঞানে জ্ঞানী মহাবীর স্বামী কেবল-জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

জৈন আগম শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে মহাবীর স্বামীর পিতা-মাতা ছিলেন আড়াইশো বছর পূর্বের জৈন ধর্মের তেইশ নম্বর তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উপাসক। মহাবীর স্বামীও জৈন ধর্মের তেইশ নম্বর তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুগামী ছিলেন। পার্শ্বনাথের অনুগামীরা বস্ত্র পরিধান করতেন। তাই মহাবীর স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণকালে বস্ত্র পরিধান করে থাকলেও এক বছর এক মাস পর সেটিকেও ত্যাগ করে সাধনার দ্বিতীয় বছরে তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে তপস্যা করেন। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে, ভিক্ষাপাত্র না নিয়ে, করতলে ভিক্ষা গ্রহণ পূর্বক শীত-গ্রীষ্মের আট মাস সাধনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতেন এবং বর্ষার চার মাস তিনি একই স্থানে অবস্থান করতেন। জৈন আগমানুসারে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পাঁচ রাত্রির বেশি কোথাও থাকতেন না। মহাবীর স্বামী কৃতকর্ম ক্ষয়ের চেষ্টায় প্রবল কৃচ্ছসাধন করতেন। তিনি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-কষ্ট, ইহলোক-পরলোক, সকল বিষয়ের প্রতিই ছিলেন উদাসীন, অনাসক্ত। এমনকি তিনি জীবন-মৃত্যু কিছুই কামনা করতেন না। সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাও তিনি সাবলীলভাবে সহ্য করতেন। সত্য-সংযম-তপস্যা ও চারিত্র সহকারে নির্লিপ্তভাবে ধ্যানে মহাবীর স্বামী দীর্ঘ বারো বছর অতিবাহিত করার পর সাধনার তেরো বছরে তিনি বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে ঋজুপালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিকা গ্রামে সামাগ নামক গৃহস্থের ক্ষেত্রমধ্যে শালবৃক্ষ তলে অনন্ত, অনুত্তর, নিরাবরণ, সম্পূর্ণ, সমগ্র কেবল জ্ঞান লাভ করেন এবং তিনি কেবলী নামে প্রসিদ্ধ হন।

শ্বেতাম্বর মতানুসারে মহাবীর স্বামীর তপস্যা ও সাধনা সম্পর্কে উক্ত বর্ণনা থাকলেও দিগম্বর মতানুসারে মহাবীর স্বামীর সাধনার বর্ণনায় ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। দিগম্বর মতে মহাবীর স্বামী দীর্ঘ ছয় মাস ধ্যানমগ্ন থেকেও মনঃপর্যায়-জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। মনঃপর্যায়-জ্ঞানার্জনে মহাবীর স্বামীকে বহু প্রচেষ্টা করতে হয়। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে মনঃপর্যায়-জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ছয় মাস উপবাসের পর কুলাধিপ নৃপতির আহ্বানে দুগ্ধ ও অন্নে তিনি উপবাস ব্রত (পারণ) সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই উপবাস ভঙ্গের পর তিনি বারো বছর তপস্যার জন্য বিভিন্ন অরণ্যে পরিভ্রমণ করা সত্ত্বেও মনঃপর্যায়-জ্ঞান লাভ অধরাই ছিল। মনঃপর্যায়-জ্ঞানার্জনে পিপাসু মহাবীর পরিশেষে উজ্জয়িনীর শ্মশানে তপস্যায় মগ্ন হলেন। কথিত আছে রুদ্র ও রুদ্রাণী নানা উপায়ে মহাবীর স্বামীর তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তপস্যার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনঃপর্যায়-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এরপর শ্রমন মহাবীর পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে নদীর তীরে এক শাল গাছের নিচে কেবল জ্ঞান অর্জন করেন এবং সিদ্ধি লাভের পর তাঁর নাম হয় মহাবীর, কেবলী, জিন ইত্যাদি। রিক্ত, নগ্ন, ধ্যানামগ্ন সন্ন্যাসী মহাবীরকে দেবরাজ ইন্দ্র সন্ন্যাসীর অজ্ঞাতসারেই একটি বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছিলেন - এমনই একটি কাহিনী দিগম্বর মতে প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে সোমদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে মহাবীর স্বামীর ইন্দ্র প্রদত্ত বস্ত্রটির দানের কাহিনীর উল্লেখ দিগম্বর শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই কাহিনীর সঙ্গেই বলদ চুরির অপরাধে প্রহারে মত্ত কৃষকের হাত থেকে বাহ্য জ্ঞানশূন্য মহাবীর স্বামীকে দেবরাজ ইন্দ্রের রক্ষা করার অপর একটি কাহিনীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই কাহিনীটি এরূপ—"কুমারগ্রাম নামক গ্রামের বাইরে পথের ধারে এককালে মহাবীর স্বামী নিশ্চল অবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন কৃষক তার বলদ দুটো সেখানে ছেড়ে দিয়ে মহাবীর স্বামীকে দেখতে বলে ক্ষেতে চলে যায়। ফিরে এসে বলদ দুটোকে দেখতে না পেয়ে এবং মহাবীর স্বামীর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে পুরো রাত্রি সারা গ্রাম খুঁজে বেড়ায়। ইতিমধ্যে বলদ দুটো ঘাস ও জল খেয়ে ফিরে এসে মহাবীর স্বামীর নিকট শুয়ে ছিল। প্রাতঃকালে ওই কৃষক মহাবীর স্বামীর নিকট বলদ দুটোকে দেখে তাঁকে চোর মনে করে প্রহার করতে থাকে। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র এসে কৃষকের প্রহার হতে মহাবীর স্বামীকে রক্ষা করেন ।" মহাবীর স্বামীর জ্ঞানার্জন সম্পর্কে এরূপ কৃচ্ছসাধনার কথাই দিগম্বর মতে প্রচলিত আছে।

কল্পসূত্রে উল্লেখ আছে মহাবীর স্বামীর সন্ন্যাস জীবনের প্রথম বারো বছর তপস্যায় অতিবাহিত হয়। ভগবতী- সূত্রের পনের নম্বর অধ্যায় উল্লেখ আছে যে সন্ন্যাস জীবনের দ্বিতীয় বছরে নালন্দায় তিনি মোঙ্খলিপুত্ত গোশালকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা একসাথে ছয় বছর অতিবাহিত করেন। এরপর তাঁরা তাঁদের মতবাদের ভিন্নতার কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের মতবাদ প্রচার করেন। বেণীমাধব বড়ুয়ার মতানুসারে, মহাবীর স্বামী তাঁর

সন্ন্যাস জীবনের দ্বিতীয় বছরে পার্শ্বনাথের ধর্মীয় অনুশাসন ত্যাগ করেন এবং গোশালর মতবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ছয় বছর পর গোশালর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের কারণে তিনি গোশালর সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং পার্শ্বনাথের ধর্মীয় অনুশাসনের আদলে নিজের ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দ্বারাই জৈন ধর্মের চতুঃ-মহাব্রত পালনের পরিবর্তে পঞ্চ-মহাব্রত পালনের প্রচলন হয়। মহাবীর স্বামী পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত চতুঃ-মহাব্রত পালনের সঙ্গে আরও একটা অতিরিক্ত মহাব্রত যোগ করে পঞ্চ-মহাব্রতের প্রচলন করেন। পঞ্চম মহাব্রত 'ব্রহ্মচর্য' প্রচলন করা হয়েছিল প্রধারণত নগ্ন সন্ন্যাসীদের নৈতিক অবনতি রুখতে। যেহেতু মহাবীর স্বামী পার্শ্বনাথের ওই চার মতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন তাই পার্শ্বনাথের অনুগামীরাও মহাবীর স্বামীকে তাদের প্রধান ধর্মীয় পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বস্ত্র পরিহিত পার্শ্বনাথের অনুগামীরা মহাবীর স্বামীর নগ্নতায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন। এই নগ্নতাকে তাঁরা হয়তো খুব একটা মেনে নিতেও পারেননি। এর ফলে কোন বিভেদ তৈরি না হলেও মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। মহাবীর স্বামীর মোক্ষ প্রাপ্তির পর তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সেই মানসিক দূরত্ব বিভেদে পরিণত হল। হয়তবা এই সময়ই জৈন ধর্মের শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর এই দুই শাখার উদ্ভব হয় বলে মনে করা যেতে পারে, যার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান।

সর্বজ্ঞত্ব মহাবীর স্বামী জীবের দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে যে ধর্ম প্রচার করতেন সেই ধর্মের মূল বিষয়বস্তু হলো জন্ম, জাতি বা বর্ণ মূল্যহীন, সম্পূর্ণ কর্মক্ষয় দ্বারাই জীব শাশ্বত সুখ লাভ করতে সক্ষম। ভগবান মহাবীর এর প্রচারিত জৈন ধর্মের মূল কথাই হল ক্রমিকবিকাশের পথে আত্মার মুক্তি, আত্মাকে কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত করাই হলো মোক্ষ। মোক্ষপথে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভিত্তি — জীব (আত্মা), অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ — এই নয়টি তত্ত্ব। এই নয়টি তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্র — এই রত্নত্রয় যুক্ত হলে তবেই সাধক মুক্তি মার্গে অগ্রসর হতে পারে। এই রত্নত্রয় জৈন ধর্মে ত্রিরত্ন নামে পরিচিত। জৈন মতে মানব জীবন মুক্তি লাভের জন্য শ্রেষ্ঠতম, কারণ, একমাত্র মানুষই মুক্তির জন্য যোগ সাধনায় সমর্থ। জৈন ধর্মে ঈশ্বর উপাসনার কোন স্থান নেই। জৈন ধর্মের তত্ত্ব কথা হলো, সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত। তৎকালীন সমাজে জাতি- বর্ণ বিভেদের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ এরূপ জাতি-বর্ণ-হীন ধর্মীয় মূল্যবোধকে সহজেই গ্রহণ করতে চাইল। মহাবীর স্বামীর সংযম ও চারিত্রপূর্ণ জীবনশৈলীতে আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্মমত গ্রহণ করল বহু নর-নারী। কর্ম-ভারাক্রান্ত জীবের দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল এই ধর্মমতের মূল উদ্দেশ্য। মহাবীর স্বামী এই পথ সমাজকে প্রদর্শনের জন্য স্বশিষ্য বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। উত্তর ও দক্ষিণে বিহারে এবং পশ্চিমে কৌশাম্বী পর্যন্ত ভ্রমণ করে মহাবীর স্বামী নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। মহাবীর স্বামীর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র গুলি হল রাজগৃহ, চম্পা, বৈশালী এবং পাবা। তাঁর প্রধান প্রচার স্থল

ছিল রাজগৃহের নালন্দা অঞ্চল। জৈন আগম অনুসারে মহাবীর স্বামীর শিষ্য সংখ্যা ছিল প্রায় চোদ্দো হাজর। মহাবীর স্বামীর প্রধান ঘনিষ্ঠ এগারো জন শিষ্য 'গণধর' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা তাঁর অনুগামী শ্রমণদের সামগ্রিকভাবে পরিচালিত করতেন। মহাবীর স্বামীর শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও প্রধান দুই 'গণধর' হলেন গৌতম ইন্দ্রভূতি এবং সুধর্মা স্বামী। যাঁরা মহাবীর স্বামীর মোক্ষ প্রাপ্তির যথাক্রমে বারো এবং কুড়ি বছর পর্যন্ত মহাবীর স্বামী প্রবর্তিত ধর্মমত প্রচারের পর মোক্ষ প্রাপ্ত হন। সংঘের সকলকে কঠোর নিয়ম, সংযম মানতে হতো। মহিলাদেরও সংঘে স্থান দেওয়া হতো। জৈন সংঘের পুরুষেরা সাধু এবং মহিলারা সাধ্বী নামে পরিচিত হতেন। জৈন ধর্মের গৃহী উপাসকরা শ্রাবক-শ্রাবিকা নামে সমাজে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন বড় রাজারাও ছিলেন তাঁর শিষ্য। বৈশালীর রাজা চেটক, অঙ্গরাজ অজাতশত্রু, কৌশম্বীর রাজা শতানীক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মগধাধিপতি বিম্বিসার মহাবীর স্বামীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞাতাধর্মকথা অনুসারে জানা যায় —মগধরাজ বিম্বিসার পুত্র অভয় ছিলেন জৈন ধর্মমতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মহাবীর স্বামীর অনুগামীদের মধ্যে সমাজের বণিক এবং শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ই ছিল প্রধান। জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঐতিহাসিক রাজ ব্যক্তিত্ব বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর নাম জৈন শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া গেলেও বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই পরস্পর বিরোধী সমসাময়িক ধর্মমতের ইতিহাস বর্ণনাতেও এই দুই রাজ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বিবরণ দেখা যায়, এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ইতিহাসে আজও একথা স্পষ্ট নয় যে ওই দুই রাজ ব্যক্তিত্ব আসলে কোন ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং নিরপেক্ষ ইতিহাসের বর্ণনা করতে হলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে ঐতিহাসিক রাজব্যক্তিত্ব ধার্মিক বিম্বিসার উভয় ধর্মের প্রতি সমান ভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই স্থানে একথা একান্ত উল্লেখ্য যে মহাবীর স্বামী (পূর্বের বর্ধমান) মগধাধিপতি বিম্বিসারের শ্যালক ছিলেন। শ্যালকের তত্ত্ব-চিন্তা দ্বারা সিদ্ধি লাভে বিম্বিসার খুবই অনুপ্রাণিত ছিলেন। মহাবীর স্বামী যখন রাজগৃহে স্বশিষ্য পদার্পণ করেন তখন রাজা বিম্বিসার তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর ধর্মমত প্রচার এর জন্য সকল ব্যবস্থা করেন। পরম ধার্মিক ন্যায়পরায়ন বিম্বিসার এর পুত্র অজাতশত্রু ছিলেন রাজ্যশাসনের লোভে পিতৃহত্যার পাপে পাপী দাম্ভিক রাজা। তিনি রাজনৈতিক কারণে প্রথমে জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতা করেন। ইতিহাস এ কথা স্বীকার করে যে তিনি কখনও কোন ধর্মমত স্বীকার করেননি। তিনি ছিলেন সর্বধর্মদ্বেষী রাজ্য লোলুপ রাজা। তিনি সর্বদা রাজনীতির খাতিরে কখনো জৈন ধর্মের আবার কখনো বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অজাতশত্রুর এরূপ মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন-

"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।
এই কটি কথা জেনো মনে সার ভুলিলে বিপদ হবে।"

এই ঐতিহাসিক রাজ ব্যক্তিত্বদের উভয় ধর্মের ইতিহাসে স্থান পাওয়া নিয়ে শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর **কল্পসূত্রের** ভূমিকাতে একথা স্পষ্ট করেছেন যে এই ইতিহাস যেন "অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায়"। যাইহোক, জৈন ধর্মের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী তাঁর ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ **একচল্লিশ** বছর নানা স্থানে **পরিভ্রমণ** করেন। **কল্পসূত্রে** মহাবীর স্বামী এই ধর্ম প্রচারের সময়কাল কীভাবে কোথায় অতিবাহিত করেছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি প্রথম বর্ষাবাস কাটিয়েছিলেন অস্থিক গ্রাম বা বর্ধমানে, যেখানে তিনি প্রবল অত্যাচারিত হয়েছিলেন, এবং অন্তিম বর্ষাবাস কাটিয়েছিলেন অধুনা পাটনার নিকট পাপ-নগরে, **যার** রাজা ছিলেন হস্তিপাল। এই স্থানেই ভগবান মহাবীর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে **উত্তরাধ্যায়নসূত্র** শেষ করেন।

সাধনার দ্বারা সমাজের দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির উপায় প্রদর্শনকারী সর্বজ্ঞ ভগবান মহাবীর ৫২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৭২ বছর বয়সে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে রাত্রির শেষ ভাগে হস্তিপাল রাজার রাজ্যে সকল বন্ধন ছিন্ন করে মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি তাঁর প্রচারিত জৈন ধর্মমত আজও অমলিন ভাবে বহু মানুষ সানন্দে গ্রহণ করে চলেছেন।

তথ্যসূচী :

উইন্টারনিট্জ্, মরিস, আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার (ভলিউম্- ২), ক্যালকাটা, ১৯৩৩.

চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত কুমার, কল্পসূত্র, কলকাতা, ১৯৫৩.

জৈন, জগদীশ চন্দ্র, প্রাকৃত সাহিত্য কা ইতিহাস, বারানসী, ২০১৪.

বড়ুয়া, বেণীমাধব, আ হিস্ট্রি অফ প্রি বুদ্ধিস্টিক ইন্ডিয়ান ফিলোজফি, কলকাতা, ১৯২১.

প্রসাদ, শীতল, আ কম্প্যারেটিভ স্টাডি অফ জৈনিজম্ এন্ড বুদ্ধিজম্, দিল্লি, ১৯৩২.

জৈন সাগরমল, অরুণ প্রতাপ সিং, জৈন্ এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, বারানসী, ১৯৮৩.

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ, জনপদজ্ ইন বুদ্ধিস্ট এনসেন্ট ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৬৪.

ভিক্ষু, বুদ্ধদত্ত, দা ওয়ে অফ লিভিং অফ জৈন্ এন্ড বুদ্ধিস্ট মঙ্কস্, কলকাতা, ১৯৭১.

বোথরা, পুষ্পা, দা জৈন্ থিওরি অফ প্রিসেপশন, কলকাতা, ১৯৭০.

মেহতা, এম. এল., সাইকোলজিকাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ কর্ম, বেনারস, ১৯৫৫.

দেও, শান্তারাম ভালচন্দ্র, হিস্ট্রি অফ জৈন্ মনার্কিজম্, বম্বে, ১৯৫২.

জৈন, উত্তম কমল, অরিজিন এন্ড ডেভলপমেন্ট অফ জৈন্ সেক্টস্ এন্ড স্কুলস্, কুরুক্ষেত্র, ১৯৭২.

জৈন, পি. এস., জেন্ডার অ্যান্ড স্যালভেশন, দিল্লী, ১৯৯২.

শর্মা, ব্রিজেন্দ্রনাথ, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল্ হিস্ট্রি অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৭২.

শাহ্, এম. ও., ভগবতী (সম্পাদিত), গুজরাট, ১৯১৮.

জৈনি, পি. স., দ্য জৈন্ পাথ অফ পিউরিফিকেশন্, দিল্লী, ১৯৭৯.

বরোদিআ, ইউ জি, হিস্ট্রি এন্ড লিটারেচার অফ জৈনিজম্, বম্বে, ১৯৫১.

ভট্টাচার্য্য, জগৎ রাম, দশবৈকালিক সূত্র, কলকাতা, ২০০১.

ভট্টাচার্য্য, জগৎ রাম, স্টুডিআ ইন্ডোলজিকা (সম্পাদিত), দিল্লী, ২০০৭.

কাইয়া, কোলেট, বলবীর নলিনী, জৈন্ স্টাডিজ্ (সম্পাদিত), দিল্লী, ২০০৮.

আদি তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের তাৎপর্য

- মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

ভারত বর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে মহামানবেরা এসেছেন এবং মানবজাতিকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন, দেখিয়েছেন জীবনে চলার সঠিক পথ। জৈন ধর্মাদর্শ এই সত্যে আবাহনকারীদের আগমন ও পথকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করেনা। জৈন মতে এই জগৎ ও তার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জৈন মহাপুরুষগণ সঠিক কালপর্ব নির্ধারণ করেছেন; আর সেই শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের স্ব স্ব কালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে। জৈন মতে এরাই তীর্থঙ্কর। আমারা জানি যে, প্রত্যেক অবসর্পিনী ও উৎসর্পিনীর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটে; এই সংখ্যা নির্দিষ্ট। এরকমই বর্তমান কালচক্রের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের প্রথম জন হলেন ঋষভদেব বা ঋষভনাথ এবং শেষ জন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র, যিনি নিজেকে জয় করার কারণে মহাবীর নামে জগতে খ্যাত হয়েছেন। আদতে সব তীর্থঙ্করই জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ এবং স্ব স্ব কালের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক এবং দ্রষ্টা। তাঁরা আত্মিক, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক - সব মার্গেই মানুষকে শিক্ষা দেন এবং জানান মুক্তি, মোক্ষ বা নির্বাণের সঠিক বার্তা।

বর্তমান কালচক্রের প্রথম তীর্থঙ্কর হওয়ার কারণে ঋষভদেবের গুরুত্ব অপরিসীম। সেইসাথে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর জীবনাচরণ, যা থেকে আমরা পেতে পারি অমূল্য শিক্ষা। ঋষভ দেবের এক উপাধি আদিনাথ, যা আমরা জানি। তার অন্যান্য উপাধিগুলোও আমাদের জন্য জ্ঞাতব্য; যথা আদীশ্বর, যুগদেব, প্রথম রাজেশ্বর এবং মহারাজ নাভির পুত্র বলে তার আরেক নাম নাভেয়। তাঁর মায়ের নাম ছিল মরুদেবী। ঋষভদেব আদর্শ পুরুষ নামেও জগতে খ্যাত। তিনিই ছিলেন মহারাজ ইক্ষ্বাকু, যিনি ছিলেন কোশল রাজ্যের প্রথম অধিপতি এবং সনাতন ধর্মে বর্ণিত মানবজাতির আদিপিতা শ্রদ্ধাদেব মনুর দশ পুত্রের একজন। আমরা জৈন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আদিপুরাণে ঋষভদেব সম্পর্কে সম্যক ও বিস্তারিত তথ্য পাই। জৈন মতে তিনি প্রচলিত হিসাবে $১০^{২২৪}$ বছর পূর্বে ধরাধামে আগমন করেন এবং তার সুদীর্ঘ পার্থিব জীবনকাল ছিল ৮,৪০০,০০০ পূর্ব, যা প্রচলিত হিসাবে ৫৯২.৭০৪ × $১০^{১৮}$ বছর। তার জীবনের এক অনুপম ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পালিত হয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব।

আমরা যা আদিপুরাণ থেকে জানতে পারি, তা হচ্ছে আদিশ্বর ঋষভ দেব তাঁর প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধিতে জগতের সার বুঝতে যখন সক্ষম হলেন, তখন তিনি তাঁর অযোধ্যার রাজ্যপাট, অর্থ-বিত্ত, সমস্ত বিলাস-ব্যসন এমনকি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করে দিগম্বর মুনি হয়ে যান এবং কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। এই অবস্থায় টানা ৪০০ দিন সমস্ত পানাহার ত্যাগ করেন। ৪০০ দিন পর তিনি আখের রস পান করে পারণা করেন। এই পারণার ঘটনাটি ঘটেছিল বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথীতে। ভগবানকে আখের রস আহার দান করে রাজা শ্রেয়াংশ কুমার অক্ষয়

সুখের অধিকারী হন। তাই এই তিথির নামকরণ করা হয় অক্ষয় তৃতীয়া। এক বছরের অধিক কালব্যাপী এই তপস্যা সাধিত হওয়ায় জৈন সম্প্রদায়ের কেউ কেউ একে 'বর্ষীতপ' বলেও সম্বোধন করেন।

টানা ৪০০ দিন উপবাস শেষে ঋষভদেব তাঁর আহার অন্বেষণে বের হলেন। কিন্তু কেউ সেই সময় অনগার সাধুকে বিধিসম্মতভাবে আহার দানের পদ্ধতি জানত না। ফলে প্রভুর প্রতি অগাধ ভক্তির কারণে অনেকেই তাঁকে হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য, সোনা, রূপা, এমনকি সুন্দরী কন্যা পর্যন্ত দান করতে চাইল। অনেক রাজা মহারাজা তাঁদের রাজমুকুট পর্যন্ত প্রভুর পায়ে সমর্পণ করতে চাইলেন। কিন্তু প্রভু সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। কারো মনেই ভগবানকে আহার বা পানীয় দানের কথা এল না।

অন্যদিকে জম্বুদ্বীপের ভরতক্ষেত্রের কুরুজঙ্গল রাজ্যের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। এখানকার ন্যায়নিষ্ঠ যুবরাজ শ্রেয়াংশকুমার একই রাতে ৭ বার স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি সুবর্ণ সুমেরু পর্বত, একটি সিংহ, একটি ষাড়, সূর্য, চন্দ্র, মহাসমুদ্র এবং ব্যন্তর দেবগণকে, যাঁরা বহন করছিলেন অষ্টমঙ্গল দ্রব্য। পরের দিন তিনি তাঁর প্রজ্ঞাবান ছোট ভাই সোমপ্রভাকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। সোমপ্রভা এর উত্তরে জানান যে, আজই এক দৈবপুরুষের আগমন ঘটবে মহারাজ শ্রেয়াংশ কুমারের রাজপ্রাসাদে।

কিছুক্ষণ পরই বিহাররত ভগবান আদীশ্বর ঋষভ দেবের আগমন ঘটে হস্তিনাপুরে। শ্রেয়াংশ কুমার তখন প্রাসাদে নিজের কক্ষে বাতায়নের পাশে বসে নিজের পূর্বরাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা ভাবছিলেন। সহসা তাঁর দৃষ্টি ভগবানের উপর পড়ে। গবাক্ষপথে ভগবানকে দেখতেই শ্রেয়াংশের মনে জাতিস্মরণ জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি তাঁর পূর্বজন্মসমূহ স্মরণ করতে পারেন। ফলে নির্গ্রন্থ শ্রমণকে আহার দানের পদ্ধতি তাঁর মনে পড়ে যায়। কারণ তাঁর অষ্টম পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন রাজা বজ্রজঙ্ঘর স্ত্রী রানী শ্রীমতী। আর রাজা বজ্রজঙ্ঘ ছিলেন আদতে আদিনাথ ঋষভদেব। একদা তাঁরা এক অরণ্যে একটি পুকুরের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় দুই মুনিরাজ দামোদর ও সাগর সেন আকাশপথে বিচরণ করছিলেন। আর, তাঁরা শুধু বনেই আহার গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। ফলে রাজা-রানী সম্ভ্রমের সাথে তাঁদের পদগ্রহণ রীতি সুসম্পন্ন করেন এবং নবধাভক্তির মাধ্যমে আহার দান করেন। আর, দেবগণ পঞ্চাশশ্রেয় পালন করেন।

ঘটনা স্মরণ হওয়া মাত্রই শ্রেয়াংশকুমার দ্রুত প্রাসাদ থেকে নেমে এসে তাঁর ভাই এবং রানীকে সঙ্গে নিয়ে আদিনাথ ঋষভ দেবকে নমস্কার করতে করতে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তাঁকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন ও অষ্ট উপাচার দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। তারপর তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধতম আখের রস নিয়ে ভক্তিভরে বিনম্রচিত্তে

বললেন, “হে প্রভু! আমার মন পবিত্র, আমার বাক্য পবিত্র, আমার দেহ ও আত্মা পবিত্র, খাদ্য ও জল পবিত্র। অনুগ্রহ করে এই আহার গ্রহন করুন।" এরপরই আদিনাথ ঋষভদেব সেই ইক্ষুরস আহার করেন। সুপাত্রদানের প্রভাবে শ্রেয়াংশকুমার মোক্ষের অধিকারী হলেন; দেবতারা পঞ্চদিব্য প্রকট করলেন এবং যুবরাজ অক্ষয় সুখ লাভ করলেন।

এই অসাধারণ ঘটনাকে প্রতিবছরই সারা পৃথিবী জুড়ে জৈন ধর্মাবলম্বীরা স্মরণ করেন। প্রচুর সংখ্যায় জৈনধর্মালম্বী মানুষ বর্ষীতপকরে ঐ দিন হস্তিনাপুর গিয়ে আখের রসে পারণা করেন। তবে তীর্থঙ্করের শারীরিক ও মানসিক শক্তির তুল্য কখনও সাধারণ মানুষ হতে পারে না। তাই এখন একান্তর তপের মাধ্যমে বর্ষীতপ করা হয়। অর্থাৎ একদিন আহার এবং পরদিন উপবাস – এইভাবে একটানা দুই বছরের তপকে বর্ষীতপ ধরা হয়। এইদিন সকলে সভ্যতার আদিপুরুষ তথা প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথকে স্মরণ করেন, আর ভক্তরা বুঝতে পারেন একজন তীর্থঙ্করের প্রকৃত মর্যাদা ও মাহাত্ম্য।

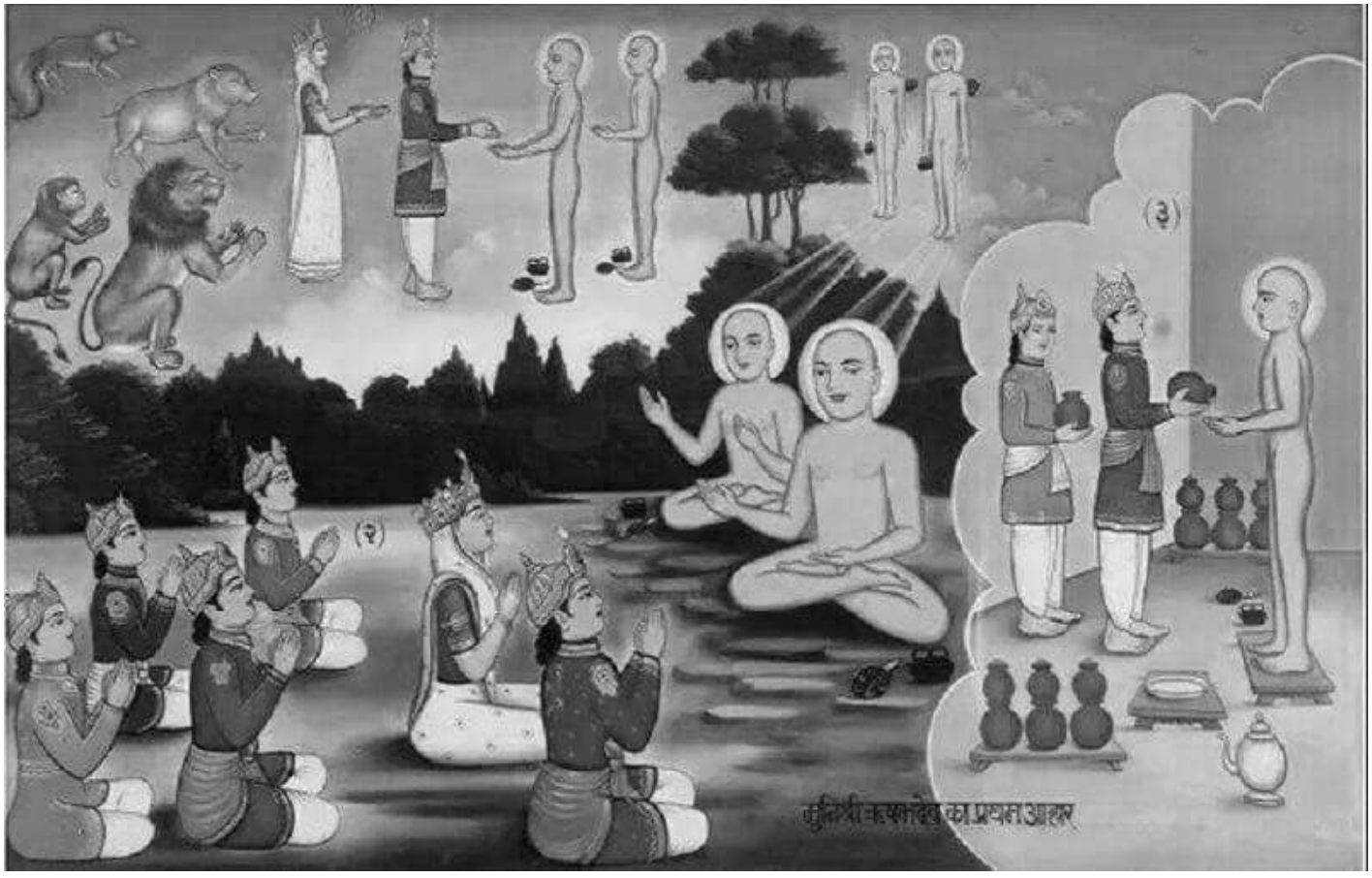

ভারতের মহীয়সী; সুলসা শ্রাবিকা

- সুখময় মাজী

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কুশাগ্রপুর নামক একটি নগর ছিল। সেই নগরে নাগ নামক একজন সারথি ছিল। সে ছিল রাজা প্রসেনজিতের সেবক। তার স্ত্রী ছিল সুলসা। সে ছিল চরিত্র, সদাচার, পাতিব্রত্য এবং সম্যক্ত্বে অত্যন্ত সুদৃঢ়। তার মত এমন ভক্তিমতী জিনোপাসিকা পৃথিবীতে বিরল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত সুখেই তাদের জীবন কেটে যাছিল। কিন্তু তবুও সুলসার মনের সঙ্গোপনে একটা কষ্ট ছিল; তাদের কোনও পুত্র ছিল না। পতিব্রতা সুলসা বংশরক্ষার জন্য স্বামীকে আবার বিয়ে করার জন্য বারবার অনুরোধ করত। কিন্তু তার স্বামী নাগ ছিল অত্যন্ত বিবেকবান; তাই সে তার স্ত্রীর কথায় কান দিত না।

সুলসা ব্রহ্মচর্য যুক্ত আচাম্ল ইত্যাদি বিভিন্ন তপ করতে শুরু করল। তাঁর জিনভক্তি, চরিত্র এবং তপস্যার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন সৌধর্ম দেবলোকে দেবরাজ শক্রেন্দ্র তাঁর সভায় কথায় কথায় সুলসার কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, "এখন ভরত ক্ষেত্রে সুলসা নামে এমন একজন শ্রাবিকা রয়েছে, যে দেব, গুরু এবং ধর্মের আরাধনায় অত্যন্ত নিষ্ঠাপুর্বক তৎপর। তাঁর মতো শ্রাবিকা অত্যন্ত বিরল"। ইন্দ্রের এই কথায় সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু একজন দেবতার এই কথা বিশ্বাস হল না। তিনি সুলসাকে পরীক্ষা করার জন্য সাধুর বেশে সুলসার নিকট এলেন। তাঁকে দেখে সুলসা উঠে দাঁড়িয়ে বন্দনা করল। মুনিবেশী ঐ দেবতা সুলসাকে বললেন, "একজন সাধু অত্যন্ত পীড়িত হয়েছেন; তাঁর চিকিৎসার জন্য লক্ষপাক তেলের প্রয়োজন। তাই আমি লক্ষপাক তেলের জন্য তোমার কাছে জন্য এলাম"। সাধুর এই কথা শুনে সুলসা অত্যন্ত আনন্দিত হল। সাধুসেবা করার এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে সে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে গণ্য করল। সে বলল, "মুনিবর! আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই এক কলস তেল এনে দিচ্ছি"। সে তেলের কলস আনার জন্য গেল। কলস আনতে আনতে হঠাৎ তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে কলসটি ভেঙে গেল এবং পুরো তেল নষ্ট হয়ে গেল। বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হয়ে সুলসা আবার আর এক কলস তেল আনার জন্য ঘরে ঢুকল। কিন্তু এবারও সেই কলস হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল এবং তেল নষ্ট হয়ে গেল। এইভাবে পর পর সাত কলস তেল দেবতার ছলনায় নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মহামূল্যবান এই সাত কলস লক্ষপাক তেল নষ্ট হওয়ার জন্য সুলসার মনে এতটুকুও

দুঃখ হল না। সে বরং দুঃখিত হয়ে ভাবতে লাগল, হায়! আমি কত বড় অভাগিনী। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমার বাড়ির লক্ষপাক তেল মহাব্রতধারী মুনি মহারাজের কোনও কাজে লাগল না।

তখন ঐ দেবতা নিজের আসল রূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "হে ভদ্রে! দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্র তোমার ধর্মনিষ্ঠার অনেক প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয়নি। তাই তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি স্বয়ং এসেছিলাম। এখন নিজের চোখে তোমার ধর্মনিষ্ঠা দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে বর দিতে চাই। তুমি তোমার ইচ্ছা মতো বর চেয়ে নাও"।

সুলসা বলল, "হে দেব! আমার কোনও পুত্র নেই। আপনি যদি সত্যিই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে পুত্র লাভের বর দিন"।

দেবতা তখন তাকে বত্রিশটি বড়ি দিলেন এবং বললেন, "এই বড়িগুলি তুমি একটি একটি করে পর পর খাবে; এর ফলে তুমি বত্রিশটি পুত্র লাভ করতে পারবে। এছাড়াও যখনই তোমার আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তখনই তুমি আমাকে স্মরণ করবে; আমি তৎক্ষণাৎ এসে তোমায় সাহায্য করব"। এই বলে দেবতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সুলসা চিন্তা করল, যদি এই বড়িগুলি একটির পর একটি খাই, তাহলে একটির পর একটি পুত্র হবে, আর আমার সারাজীবন ছেলে মানুষ করতে করতে পেরিয়ে যাবে। আমার ধর্ম সাধনায় প্রচুর ব্যাঘাত হবে। এর চেয়ে বরং একসাথে সমস্ত বড়ি গুলি খেয়ে নি। তাতে একবারেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। এই ভেবে সে বত্রিশটি বড়িই একসাথেই খেয়ে নিল। বড়ির প্রভাবে তার গর্ভে একসাথেই বত্রিশটি পুত্র উৎপন্ন হল। গর্ভে একটি পুত্রের ভার বহন করাই কষ্টসাধ্য; সেখানে বত্রিশটি পুত্র গর্ভে বহন করতে সুলসাকে যে কী ভয়ংকর কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, সেটা সহজেই অনুমেয়। প্রচন্ড কষ্ট সহ্য না করতে পেরে সুলসা সেই দেবতাকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করামাত্রই দেবতা এসে আবির্ভুত হলেন। সুলসার কাছে সব কিছু শুনে তিনি বললেন, "হে সুলসা! তোমার এইভাবে বত্রিশটি বড়ি একসাথে খেয়ে নেওয়া উচিত হয়নি। তোমার গর্ভে এখন বত্রিশটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছে। সেই জন্যই তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ। তবে তোমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার পীড়া এখনই দূর হয়ে যাবে এবং যথা সময়ে তোমার সর্বসুলক্ষণযুক্ত বত্রিশটি পুত্র জন্ম লাভ করবে"। এই বলে দেবতা তাঁকে গূঢ়গর্ভা করে দিলেন; তাঁর সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল।

এরপর কোনও এক দিন শুভ মুহূর্তে সুলসা বত্রিশ জন সুলক্ষণ পুত্রের জন্ম দিল। এই বত্রিশ কুমার ধীরে ধীরে বড় হয়ে যখন যৌবন প্রাপ্ত হল তখন তারা রাজা শ্রেণিকের অঙ্গরক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হল। তাদের আচার আচরণে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। যখন রাজা শ্রেণিক বৈশালী গেলেন, তখন এরা বত্রিশ ভাইও রাজার সঙ্গে গেল এবং চেল্লনা হরণের সময় রাজা শ্রেণিককে রক্ষা করতে গিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল।

পুত্রদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সুলসা দুঃখে ভেঙে পড়ল। যখন সুলসা দুঃখে ভারাক্রান্ত, তখন তাকে প্রবোধ দিতে অভয়কুমার তার কাছে এলেন। অভয়কুমার তাকে বললেন, " হে সুলসা! তুমি তো সম্যকদর্শনের অধিকারিণী। তাই, জীবের স্বরূপ তোমার তো অজানা নয়। এই শরীর তো অনিত্য। অতএব, তোমার পুত্রদের শরীরের বিনাশে তোমার কি দুঃখ পাওয়া উচিৎ? সম্যক্ত্বধারিণী হয়েও তুমি অবিবেকীদের মতো কেন বৃথা শোক করছো? এটা কি তোমাকে শোভা পায়"? এই ভাবে প্রবোধন দিয়ে অভয়কুমার সুলসাকে শান্ত করলেন।

কিছুকাল পর একবার অম্বড নামক একজন পরিব্রাজক চম্পা নগরী থেকে রাজগৃহ নগরীতে যাওয়া পরিকল্পনা করলেন। তিনি ভগবান মহাবীর স্বামীকে বন্দনা করে বিনম্র ভাবে বললেন, "হে প্রভু! আজ আমি রাজগৃহ নগরে যাচ্ছি"। প্রভু বললেন, "রাজগৃহে সুলসা শ্রাবিকা থাকেন। তাঁকে আমার 'ধর্ম লাভ' জানাবে"। সেই পরিব্রাজক সেখান থেকে রওনা হয়ে একদিন রাজগৃহ নগরে এসে পৌঁছলেন। এখানে এসে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, যার জন্য প্রভু স্বয়ং নিজের মুখে 'ধর্মলাভ' বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব দৃঢ়ধর্মী হবেন। ধর্মের বিষয়ে তার স্থৈর্য কেমন, সেটা তো তাহলে একবার পরীক্ষা করতে হবে। এই রকম বিচার করে তিনি প্রথম দিন রাজগৃহ নগরের পূর্ব দিকের দরজায় নিজের তপোবলের সাহায্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের রূপ ধারণ করে বসে থাকলেন। এই আশ্চর্য বিষয় দেখে নগরের সকলেই ভাবল, স্বয়ং ব্রহ্ম এসে নগরের দ্বারে আবির্ভূত হয়েছেন। ফলে দলে দলে মানুষ তাঁকে দর্শন করতে আসতে লাগল। কিন্তু সুলসা শ্রাবিকা তাঁকে দর্শন করতে এল না। দ্বিতীয় দিন ঐ পরিব্রাজক নগরের অন্য এক দরজায় মহাদেবের রূপ ধারণ করে বসে থাকলেন। নগরের লোকেরা মহাদেবের ভক্ত হয়ে তাঁকে স্বয়ং মহাদেব ভেবে তাঁর দর্শন বন্দন করতে এল। সুলসা এবারও এল না। এরপর ঐ পরিব্রাজক তৃতীয় দিন নগরের তৃতীয় দরজায় ভগবান বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। সেখানেও নগরের সমস্ত লোক ভক্তিভরে ভগবান বিষ্ণুর দর্শন পেতে দলে দলে এসে হাজির হল এবং সত্যই তারা ভগবান বিষ্ণুর

দর্শন পেয়েছে ভেবে পরিতৃপ্ত হল। এবারেও কিন্তু সুলসা যথারীতি এল না। চতুর্থ দিন অম্বড পরিব্রাজক নগরের চতুর্থ দিকের দরজায় তপোবলে সমবসরণ সভা রচনা করলেন এবং পঁচিশতম তীর্থঙ্কর হয়ে সমবসরণ সভায় বিরাজমান হলেন। সেখানেও অন্যান্য লোকেরা এল, কিন্তু সুলসা এল না। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে সুলসার নিকট পাঠালেন। সেই ব্যক্তি সুলসার নিকট গিয়ে বলল, "দেখ, পঁচিশতম তীর্থঙ্কর ভগবান আমাদের নগরে সমবসরনে আসীন হয়েছেন। এটা আমাদের কত বড় সৌভাগ্য! তুমি ভগবানকে দর্শন-বন্দন করতে যাবে না? চল, স্বয়ং তীর্থঙ্কর ভগবান তোমাকে ডেকেছেন"। উত্তরে সুলসা বলল, "হে ভদ্র! যুগে যুগে চব্বিশ তীর্থঙ্করই আবির্ভূত হন। পঁচিশতম তীর্থঙ্কর হওয়া সম্ভবই না। নিজেকে পঁচিশতম তীর্থঙ্কর বলে দাবি করা ঐ ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই কোনো প্রতারক; মানুষকে ঠকানোর জন্য এখানে এসেছে। আমি তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর স্বামী ছাড়া আর কাউকে বন্দন করি না; কোনও দিন করবও না"।

ঐ ব্যক্তি যখন অম্বড পরিব্রাজকের কাছে ফিরে এসে সব কথা জানাল, তখন পরিব্রাজক বুঝতে পারলেন যে, সত্য সত্যই ধর্মে সুলসার আস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়। কোনও ভাবেই তাকে বিচলিত করা সম্ভব নয়। সে প্রকৃতই স্থিরস্বভাবী। অতঃপর পরিব্রাজক তাঁর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে শ্রাবকের বেশ পরিধান করে সুলসার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সুলসার খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন, " হে ভদ্রে! আপনি প্রকৃতই অতীব পুণ্যশালিনী। তাই স্বয়ং ভগবান মহাবীর নিজ মুখে আপনাকে 'ধর্মলাভ' বলে পাঠিয়েছেন"। অম্বড়ের মুখে একথা শুনেই সুলসা তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল এবং ভগবান মহাবীর স্বামীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করে স্তবন করতে লাগল, " হে মহাবীর প্রভু! আপনি মোহরূপী বলশালী রাজাকে দমন করার কাজে ধীর; আপনি পাপরূপী জঞ্জাল স্বচ্ছ করার কাজে নির্মল জলস্বরূপ এবং কর্মরূপ ধুলো দূর করার কাজে পবনস্বরূপ। হে প্রভু! সদা আপনার জয় হোক"! অম্বড পরিব্রাজক আদর্শ শ্রাবিকা সুলসার এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে তাঁর অনেক অনেক প্রশংসা ও অনুমোদনা করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

এইরূপ উত্তম গুণে সুশোভিত সুলসা জীবনভর ধর্মের পথে সুদৃঢ় থেকে বহু সৎ কর্ম করে জীবনের অন্তে আয়ু সমাপ্ত করে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হল। সেখানে দীর্ঘদিন স্বর্গসুখ ভোগ করে আগামী তীর্থঙ্কর পরম্পরার নির্মম নামক পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর রূপে যথাসময়ে পৃথিবীতে সুলসা শ্রাবিকার আবির্ভাব হবে।

শ্রাবকচরিতকথা:পুণিয়া শ্রাবক

- জয়শ্রী লাহা

একবার রাজা শ্রেণিক ভগবান মহাবীরের কাছে ধর্ম উপদেশ শ্রবণ করতে গিয়েছিলেন। উপদেশ শ্রবণের পরে রাজা ভগবান মহাবীরের কাছে নিজে পরজন্মের কথা জানতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, " হে ভগবান! মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব"? সর্বজ্ঞ ভগবান বললেন, "হে শ্রেণিক! মৃত্যুর পর তুমি নরক গতি লাভ করবে অর্থাৎ তুমি নরকে উৎপন্ন হবে। এটা ঠিক যে তুমি অনেক ভাল কাজও করেছো; কিন্তু এসব কাজ করার আগেই তোমার নরক আয়ুষ্য বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি যে সব সৎ কার্য করেছো তাঁর পরিণাম হিসেবে তুমি আগামী চব্বিশ তীর্থংকরের মধ্যে পদ্মনাভ নামক প্রথম তীরথংকর হবে"।

একথা শুনে রাজা ভগবানের কাছে নম্রতা পূর্বক নিবেদন করলেন, "হে ভগবান! এমন কোনও উপায় আছে কি যাতে আমার নরক গমন আটকানো যায়"? ভগবান বললেন, " যদি তুমি চারটি কাজের মধ্যে একটি কাজও করতে পারো তাহলে তোমার নরক গতি আটকাতে পারে। এই চারটি কাজ হল কপিলা দাসীকে দিয়ে দান দেওয়ানো, নবকারসী প্রত্যাখ্যান পালন করা, কালসৌরিক কষায়কে দিয়ে পশু হত্যা বন্ধ করানো অথবা পূনিয়া শ্রাবকের কাছ থেকে তার এক সামায়িক কিনে নেওয়া"।

রাজা শ্রেণিক প্রথমে কপিলা দাসীর কাছে গেলেন কিন্তু কপিলা দাসীকে দিয়ে দান দেওয়াতে পারলেন না। নবকারসী প্রত্যাখ্যানও তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, কাল সৌরিক কষাওকেও পশু হত্যা বন্ধ করতে রাজি হল না কেন না এটা তাঁর বংশগত পেশা। অগত্যা রাজা শ্রেণিক শেষ উপায় হিসেবে পুনিয়া শ্রাবকের বাড়ীতে গেলেন। পুনিয়া শ্রাবক ভগবান মহাবীরের পরম ভক্ত, পরম সন্তুষ্ট এবং অতি অল্প পরিগ্রহী। থাকার জন্য তাঁর ছিল একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা ঘর। সে প্রতিদিন বারো আনার তুলো কিনে নিয়ে আসত, সুতো কাটত এবং সেই সুতো বিক্রি করে যে টুকু পয়সা পেত, তা দিয়ে নিজের এবং পরিবার পরিজনদে ভরণ পোষণ করত। সর্বদা সে ধর্মচিন্তায় ডুবে থাকত। তার মনের মধ্যে কোনও কিছুর প্রতিই কোনরকম আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সে ছিল সদাসন্তুষ্ট ব্যক্তি। সুতো কাটার পর যে সময়টা বাঁচত, সেই সময় সে সামায়িক করত। সামায়িক ক্রিয়ার অর্থ সর্বজীবের প্রতি সমানুভূতি।

রাজা শ্রেণিক যখন পুনিয়া শ্রাবকের বাড়িতে হাজির হলেন, তখন পুনিয়া শ্রাবক যেমন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, তেমনই অন্যদিকে একটু ভয়ও যে পেল না, সেটা বলা যায় না। হঠাত রাজার তার বাড়িতে আসার কারণ সে বুঝতে পারল না। পুনিয়া এমন কিছু বড় মানুষ নয় যে, রাজা তাঁর বাড়িতে আসবেন। সে নিতান্তই একজন সাধারণ প্রজা যে তুলো কিনে সুতো কেটে সংসার চালায়। তাহলে রাজার হঠাত তার বাড়িতে আসার পিছণে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনও কারণ আছে। সে রাজাকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে বিনীতভাবে বলল, "মহারাজ! আপনি অনুগ্রহ করে গরিবের কুটিরে এসে এই গরিবকে ধন্য করেছেন; এই কুটিরকে পবিত্র করেছেন। আদেশ করুন, আমি কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি"?

রাজা বললেন। "শ্রাবক'জী! আমি এক অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে আপনার নিকট এলাম"।পুনিয়া বলল, "আজ্ঞা করুন, মহারাজ"। রাজা বললেন, "কথাটা খুবই সামান্য। ভগবান মহাবীর প্রভুর কাছে আমি জানতে পারলাম যে, মৃত্যুর পর আমার নরকগমন নিশ্চিত। কিন্তু এই নরকগমন আটকানোর জন্য চারটি উপায়ের কথা আমায় বলেছিলেন; এর মধ্যে তিনটিতে আমি বিফল হয়েছি। অতএব, শেষ পর্যন্ত আপনি ছাড়া আমার আর গতি নেই। একমাত্র আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন। ব্যস, আপনি শুধু আমাকে আপনার এক সামায়িক মোল দিন। তাতেই আমার নরকগমন রোধ হয়ে যাবে"।

রাজার মুখ থেকে এ'রকম অভূতপূর্ব কথা শুনে পুনিয়া অবাক হয়ে গেল। সে চিন্তায় পড়ে গেল। তাঁকে চিন্তা করতে দেখে রাজা বললেন, "হে সুশ্রাবক! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার এক সামায়িক বিনামূল্যে নেব আনা। তাঁর বিনিময়ে আপনি যত ধন সম্পত্তি চাইবেন, তা'ই দেব আপনাকে। বলুন কী পেলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন"? রাজার কথা শুনে পুণিয়া বলল, "মহারাজ! আমার সামান্য যা কিছু আছে, সে সব তো আপনারই। আপনার কোনও কাজে যদি আমি লাগতে পারি, তাতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। সে তো আমার মহা সৌভাগ্য। কিন্তু মহারাজ! আমি ধর্মের স্বরূপ যেটুকু বুঝেছি, তাতে সামায়িক কোনও লেনদেনের বস্তু বলে আমার মনে হয় না। সামায়িক তো আত্মার এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যে অনুভূতি প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। আপনি তাঁকে কিনতে চাইছেন; আমিও দেবার জন্য তৈরি। কিন্তু এর মূল্য কী হতে পারে তা তো আমার জানা নেই। যদি ভগবান মহাবীর প্রভু আপনাকে আমার সামায়িক কেনার কথা বলে থাকেন, তবে এর মূল্যটা তিনিই বলতে পারবেন। আপনি

অনুগ্রহ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন; তিনি যা মূল্য বলবেন, সেই মূল্যেই আমি আপনাকে আমার এক সামায়িক দিয়ে দেব"। অতএব, উভয়ে তখন ভগবান মহাবীরের কাছে গেলেন। রাজা শ্রেণিক পুণিয়ার সমস্ত বক্তব্য নিবেদন করে ভগবানকে পুণিয়ার এক সামায়িকের মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন।

ভগবান বললেন, "হে রাজা! তোমার সমগ্র রাজ্য এবং তোমার যাবতীয় ধনসম্পদ একত্র করলেও পুনিয়ার এক সামায়িকের দামের ভগ্নাংশও হবে না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে। একটা সামায়িককে যদি একটা ঘোড়া ধরা যায়, তবে তোমার সমগ্র রাজঋদ্ধি শুধু ঐ ঘোড়ার লাগামটার কিনতেই খরচ হবে, ঘোড়ার দাম তো এরপর দিতে হবে। তাহলে তুমি কীভাবে তাঁর সামায়িকের মূল্য দিতে পার! সামায়িকের মূল্য পার্থিব সম্পদের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। এটা হল আত্মার এক শুদ্ধ অনুভূতি। সামায়িকের মাধ্যমে আত্মার মধ্যে সমভাব তৈরি হয়। অতএব, এটা পয়সা দিয়ে ক্রয় করা কী সম্ভব!"

ভগবানের উত্তর শুনে রাজা শ্রেণিক নিরাশ হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন যে, ধর্ম তথা ধার্মিক ক্রিয়া কোনও কেনাবেচার বস্তু নয়; তা অমূল্য, আচরণ দিয়েই তা অনুভব করতে হয়।

পুণিয়া শ্রাবক ছিল ভগবান মহাবীরের পরম ভক্ত এবং যথার্থ ধার্মিক। ভগবান মহাবীরের বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেছিল। চরকা চালিয়ে সুতো কেটে সারা দিনে দু আনা রোজগারেই সে সন্তুষ্ট থাকত। ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসেবে সে এবং তাঁর স্ত্রী নিয়মিত একান্তর উপবাস করত। তার স্ত্রী দু'জনের রান্না করত, কিন্তু প্রত্যহ তারা একজন সধর্মী অতিথিকে ভোজন করাত। ফলে রোজ একজনকে উপবাস দিতে হত। স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসাথে বসে সামায়িক করত। তারা তাদের নিজেদের এই স্বল্পে সন্তুষ্ট জীবনযাত্রা নিয়ে সুখেই কালাতিপাত করত।

একদিন দু'জনে একসাথে সামায়িকে বসেছে। কিন্তু কোনোমতেই পুণিয়ার মন সামায়িকে স্থির হতে পারছে না। পুণিয়া ভাবল, এমন তো হওয়ার কথা নয়; আজ কেন আমার মন সামায়িকে স্থির হতে পারছে না! সে তাঁর স্ত্রীকে বলল, "কী ব্যাপার বলো তা! আজ সামায়িকে মন লাগছে না। আচ্ছা, তুমি কি কেমন কোনও বস্তু নিয়েছ, যা স্বেচ্ছায় কেউ তোমাকে দেয় নি, অথবা, যা নেওয়াটা অনৈতিক"?

তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ভেবে বলল, "দেখ, আমি তো অতশত জানি না। তবে আজ পথে কয়েকটা ঘুঁটে পড়ে থাকতে দেখে সেগুলো আমি নিয়ে এসেছি। আর, কোনও কিছু তো কোথা থেকেও নিই নি"। স্ত্রীর কথা শুনে পুণিয়া বলল, "রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস কি তুলে আনা ঠিক? যত তুচ্ছই হোক না কেন, সে সবই তো রাজার সম্পত্তি। অতএব, ঐ ঘুঁটেগুলো আবার রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসো; আর কোনোদিন রাস্তা থেকে কোনও জিনিস কুড়িয়ে এনো না। যে সব জিনিসে আমাদের আইনতঃ অধিকার নেই, সে সব জিনিস আমাদের চাই না"।

ধন্য পুণিয়া শ্রাবক, যার কথা স্বয়ং বীর প্রভু নিজের মুখে বলেছেন। তাঁর পবিত্র ও নির্মল জীবন রাজার সম্মুখে উদাহরণ হিসেবে দেখানোর জন্যই ভগবান মহাবীর রাজা শ্রেণিককে কৌশলে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।কত অল্পপরিগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও কতটা সুখী ছিল পুণিয়া। আসলে প্রকৃত সুখ পরিগ্রহে নেই; সুখ নিহিত থাকে আকাঙ্ক্ষা বা কামনাকে সীমিত করার মধ্যে।

জৈন ধর্ম: সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার এক জীবনপ্রণালী

- রজত সুরাণা

জৈনধর্ম একটি বিস্তৃত এবং গভীর বিষয়। জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণাদি সাহিত্যসমূহ পাঠ করলে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি। কিন্তু এখানে আমাদের উদ্দেশ্য জৈনধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা নয়, বরং সমাজে পস্পরের মধ্যে এটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাতাবরণ তৈরিতে এই ধর্মের দ্বারা নির্দেশিত জীবনাচরণ কতটা অবদান রাখে, তা বিবেচনা করা। বর্তমান সময়ের এই হিংসাদীর্ণ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনার প্রসার। আজ পৃথিবী সংকুচিত হয়ে গেছে এবং মানুষের অনুভূতি এতটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে যে নিজেদের স্বার্থে নিমগ্ন সব মানুষ নিজের স্বার্থপূরণের জন্য অপরের ক্ষতি করতে, এমনকি অপরকে ধ্বংস করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কেউ অন্যেরও অস্তিত্বের অধিকারের কথা চিন্তা করে না। সাম্প্রতিক রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ হয়তো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দিতে চাইছে; ভারতীয় উপমহাদেশে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বিপদ এতটাই বেড়েছে যে, আমরা যদি সকলের মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা জাগ্রত করতে না পারি, তবে একদিন আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব, কেউ বাঁচতে পারবে না। জৈনাচারকে যদি আমরা নিরপেক্ষ ও যৌক্তিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব, "Live and Let Live" অর্থাৎ "নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও" – এই মহৎ ভাবনার সার্থক প্রকাশ ঘটে জৈনাচারের মধ্য দিয়ে।

জৈন আগম গ্রন্থে জৈনাচারকে দুই ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- শ্রমণাচার ও শ্রাবকাচার। এখানে আমাদের সমস্যা আধুনিক সমাজে আমাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিয়ে, এবং সমাজের প্রায় পুরোটাই গৃহস্থ মানুষদের সমন্বয়ে গঠিত, তাই এখানে শুধুমাত্র শ্রাবকচার অর্থাৎ জৈন গৃহস্থদের জীবনচর্যা আলোচনা করাই বেশি উপযুক্ত হবে। শ্রমণ অর্থাৎ অনগার সাধুরা সমাজকে পথ দেখালেও শ্রমণাচার অর্থাৎ সাধুদের জীবনচর্যা সাধারণ গৃহস্থের ক্ষেত্রে পালন করা অত্যন্ত কঠিন এবং একই সাথে অপ্রয়োজনীয়।

জৈন-আগম-গ্রন্থগুলিতে মোট 12টি ব্রতের মাধ্যমে শ্রাবকাচার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচটি অণুব্রত, তিনটি শিক্ষাব্রত এবং চারটি গুণব্রত। অণুব্রতগুলিই প্রধান এবং অণুব্রতগুলি সঠিকভাবে পালনের উদ্দেশ্যে সহায়ক ব্রতরূপে গুণব্রত ও শিক্ষাব্রতগুলি পালন করতে হয়, যাদের

নাম ও স্বরূপ সংক্ষেপে নিম্নপ্রকার:-

পাঁচ প্রকার পাপের যথাসম্ভব ত্যাগকে অণুব্রত বলা হয়। এগুলি অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ – এই পঞ্চমহাব্রতেরই সহজতর রূপ। এই পঞ্চ অনুব্রত হল –

১। অহিংসা অণুব্রত – কায়মনোবাক্যে স্থূল হিংসা ত্যাগ করাই হল অহিংসা অণুব্রত। সমস্ত প্রাণীর প্রতি নিজের মতোই মমতা ভাব রেখে আগম নির্দেশিত সীমার মধ্যে নিজের অন্য বস্ত্রের ব্যবস্থা ও ব্যবহার করার কথাই বলা হয়েছে এই অণুব্রতে।

২। সত্যাণুব্রত – মোটা দাগের মিথ্যাকে পরিহার করাই হল সত্য অণুব্রত। যে সব মিথ্যা কথা বললে সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠার হানি হয়, নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়, অন্যের ক্ষতি হয় এবং রাজদণ্ড ভোগ করতে হয়, সত্য অণুব্রতে সেগুলিকে কঠোরভাবে পরিহার করতে হয়। সত্যাণুব্রতীর এ'রকম সত্য কথা বলাও উচিত নয়, যে সত্য দ্বারা অন্যের অপকার হয়।

৩। অচৌর্য অণুব্রত – স্থূল চুরি ত্যাগ করাই হল অচৌর্য অণুব্রত। এই অণুব্রতে মালিকের অনুমতি ছাড়া একমাত্র জল ও মাটি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ বা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লুঠ, ডাকাতি, পকেটমারি, অন্যের ধনসম্পত্তি বা জমিজমা হাতিয়ে নেওয়া, উৎকোচ গ্রহণ, ইত্যাদি স্থূল চুরির মধ্যে পড়ে। অচৌর্য অণুব্রতধারী শ্রাবক কোনও চোরকে সহায়তা করে না, চোরাই বস্তু ক্রয় করে না, দেশের আইন লঙ্ঘন করে না এবং কালোবাজারি ও ভেজাল থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

৪। ব্রহ্মচর্যাণুব্রত – এর অপর নাম স্বপত্নী সন্তোষ ব্রত। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটাকে স্ব-পতি সন্তোষ ব্রত বলা যেতে পারে। নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতিরেকে বাকি সমস্ত মহিলাদের প্রতি মাতৃভাব, ভগ্নীভাব অথবা কন্যাভাব পোষণ করাই হল ব্রহ্মচর্যাণুব্রত। ব্রহ্মচর্যাণুব্রতী নিজের পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্য কারো বিবাহে ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না, কাম সম্বন্ধীয় দুষ্প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন এবং চরিত্রহীন নারীপুরুষদের এড়িয়ে চলেন।

৫। পরিগ্রহপরিমাণ ব্রত – পরিগ্রহের অর্থ হল নিজের অধিকারে থাকা ধনসম্পত্তি ও জিনিষপত্র (সজীব ও নির্জীব) এবং তাদের প্রতি আসক্তি। লোভ এমনই একটা জিনিস, যাকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করলে তৃপ্ত হয় না, বরং বেড়েই চলে। তাই, পরিগ্রহপরিমাণ ব্রতী নিজের লোভকে দমন করার জন্য পরিগ্রহের একটি স্ব-আরোপিত সীমা মেনে চলে। আমার যেটুকু আছে, সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই হল পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রতের মূল কথা। এই ব্রতধারী ব্যক্তি অন্যের লাভে ঈর্ষা করে না, নিজের লাভ ও ক্ষতিতে বিশেষ বিচলিত হয় না এবং ভৃত্যদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপায় না। এই ব্রতের দ্বারা সে তার সহজাত অন্তহীন লোভের উপর লাগাম পরায়।

এই পঞ্চ অণুব্রতের বিকাশের জন্য জৈন গৃহীদের তিন প্রকার গুণব্রত পালনের কথা বলা আছে। এগুলি হল – দিগব্রত, দেশব্রত এবং অনর্থদণ্ডবিরমণ ব্রত।

৬। দিগব্রত - জীবিকা, ব্যবসা বা অন্যান্য যে কোন কারণেই হোক না কেন দশ দিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যাতায়াত করার সীমা নির্ধারণ করা এবং সেই সীমার বাইরে না যাওয়ার যে আজীবন প্রতিজ্ঞা, তাঁকেই বলা হয় দিগব্রত।

৭। দেশব্রত – দিগব্রতের মধ্য দিয়ে গৃহীত আজীবন সীমার মধ্যেও প্রয়োজন অনুসারে যাতায়াতকে সীমিত সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখার নাম হল দেশব্রত। যেমন, আমি আগামী একমাস এই নগরের বাইরে যাব না অথবা আমি আজ বাড়ি থেকে কোথাও বের হব না, এ'রকম প্রতিজ্ঞা ও তাঁর পালন করা।

৮। অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত – বিনা প্রয়োজনে কোনও পাপ কাজ করাকে অনর্থদণ্ড বলা হয়। অনর্থদণ্ড থেকে বিরত থাকাই হল অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত। এই ব্রতে ব্রতী কাউকে কুপরামর্শ দেয় না, অস্ত্রশস্ত্রাদি হিংসক উপকরণ আদানপ্রদান করে না, কারো লাভ-ক্ষতি বা জয়-পরাজয়ের বিষয়ে ব্যর্থ চিন্তা করে না, বিনা কারণে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং গাছপালার প্রতি হিংসা করে না, মনকে বিকৃত করতে পারে এমন সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি থেকে দূরে থাকে, এবং প্রয়োজনের অধিক বস্তু পাওয়ার আগ্রহ পোষণ করে না।

পঞ্চ অনুব্রতের বিকাশের জন্য যেমন তিনটি গুণব্রত পালন করা হয়, তেমনই প্রতিটি শ্রাবকেরই মনের মধ্যে ইচ্ছা থাকে মুনি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে একদিন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সংসার ও ব্যবসাবাণিজ্য বা জমিজমার দায়িত্ব তুলে দিয়ে মুনিদীক্ষা নিয়ে অনগার মুনি হওয়ার। সবাই হয়তো তা হতে পারে না, কিন্তু গৃহস্থ অবস্থাতেই মুনি হওয়ার শিক্ষা ও প্রেরণার জন্য তিনটি শিক্ষাব্রত পালনের উপদেশও জৈন ধর্মে শ্রাবকাচারের অঙ্গ হিসেবে বর্ণিত আছে। জৈন শ্রাবকেরা এই চারটি ব্রতও যথাসাধ্য পালন করেন। এই চার শিক্ষাব্রত হল –

৯। সামায়িক – জৈন শাস্ত্রে আত্মাকেই সময় বলা হয়। আত্মার গুণের কথা চিন্তন করতে করতে সমতার ভাব অভ্যাস করার নামই সামায়িক। সামায়িকে সংসার, শরীর এবং ভোগ সম্বন্ধে চিন্তন করা হয়, বারো ভাবনার চিন্তন করা হয়, চৈত্য ও চৈত্যালয়ের বন্দন, ভক্তি ইত্যাদি পাঠ করা হয় এবং ণমোকার মন্ত্র জপ করা হয়। প্রতিদিন দুই সন্ধ্যায় কমপক্ষে ২৪ মিনিট করে সামায়িকের অভ্যাস করা হয়।

১০। প্রৌষধোপবাস – অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে একাসনপূর্বক উপবাস করাই হল প্রৌষধোপবাস। শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে উত্তম, মধ্যম বা জঘন্য বিধি অনুযায়ী এই ব্রত পালন করা হয়। উপবাসের দিনটি পরিবারের এবং জীবিকার চিন্তা ত্যাগ করে ধর্মধ্যানের মাধ্যমে অতিবাহিত করা হয়।

১১। ভোগোপভোগ-পরিমাণ ব্রত – সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে ভোগ্য এবং উপভোগ্য বস্তুসমূহ ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে এই ব্রত পালন করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি অনাবশ্যক সংগ্রহ, অনাবশ্যক খরচ এবং ভোগ্য-উপভোগ্য বস্তুর প্রতি আকুলতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

১২। জৈন মতে অতিথি তাঁকেই বলা হয়, যিনি সংযম পালনের জন্য দেশ-দেশান্তরে পর্যটন করেন। নিজের জন্য রান্না করা আহারকে ভাগ করে এইরূপ অতিথিকে ভোজন করানোই হল অতিথি সংবিভাগ ব্রত।

জৈন ধর্মের অহিংসা শুধুমাত্র মানব জাতির মধ্যে সীমিত নয়; সমগ্র জীবজগৎ এর অন্তর্ভুক্ত। জৈনধর্ম অনুসারে, পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং গাছপালাকেও জীব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, জৈন ধর্মের নীতিশাস্ত্র শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুভূতি তৈরি করে না, বরং সমগ্র জীবজগতের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুভূতি তৈরি করে, যা আজকের দিনে, যখন পরিবেশও মানুষের কারণে বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তখন খুবই প্রাসঙ্গিক।ঊ

এইভাবে এটাও স্পষ্ট যে জৈনধর্মে অহিংসার ধারণা শুধুমাত্র আত্মকল্যাণের চেতনার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং সমস্ত জীবের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জৈন ধর্ম স্পষ্টভাবে বলে যে, যে মানুষ তার পায়ে অন্য প্রাণীর চর্মনির্মিত জুতো পরে এবং নিজের প্রাণভয়ে অথবা নিছক আনন্দের জন্য অন্য জীবের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করে, সে একজন মহাপাপী। জৈন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে এ'রকম অনেক উল্লেখ মেলে। যেমন -

সব্বে জীবা বি ইচ্ছংতি জীবিউং ন মরিজ্জিউং।
তমহা পাণবহং ঘোরং নিগ্গংথা বজ্জয়ন্তি ননু।। সমনসুত্তং – ১৪৮

অর্থাৎ, সমস্ত জীবই বাঁচতে চায়, কেউ মরতে চায় না, তাই নির্গ্রন্থরা জীবহত্যাকে ভয়ানক পাপ বলে নিষেধ করেছেন।

ব্রহ্মচর্যানুব্রত মানে নিজের সঙ্গী, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা, অন্য মহিলা বা অন্য পুরুষের প্রতি খারাপ দৃষ্টি না রাখা। এটিও সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম। যে সমাজে এটি ঘটে না সেখানে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে না। আজকের সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় হওয়ার কারণে সামাজিক অবক্ষয় তো আমাদের চোখের সামনেই স্পষ্ট। ত্রিকোণ প্রেমের কারণে খুনোখুনি, ব্যভিচারজনিত কারণে পারিবারিক অশান্তি, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনার ক্রমিক বৃদ্ধি, ইত্যাদির পিছনে রয়েছে ব্রহ্মচর্যানুব্রতের অভাব।

বিশ্বের মোট সম্পদ সীমিত। যদি একজন ব্যক্তি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করে তবে অন্য লোকেরা কীভাবে বাঁচবে? অতএব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অধিকারের ভূমিকাও ভীষণ

গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই যদি ন্যায়পথে উপার্জিত সম্পদে তৃপ্ত থাকে, তাহলে সমাজে অস্থিরতা উৎপন্ন হয় না।

জৈনাচারে উল্লিখিত 'ব্রত' ও 'শীল'-এর সাথে এমন অনেক কিছু অনুসরণ করার অনুপ্রেরণাও দেওয়া হয়েছে, যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করে। যেমন, সমস্ত প্রাণীর সাথে বন্ধুত্বের অনুভূতি, পুণ্যবানদের প্রতি আনন্দমিশ্রিত সম্মান, দীনদুঃখীদের প্রতি করুণা এবং দুষ্টের প্রতি মাধ্যস্থ ভাব, পালিত পশুপাখিদের বন্ধন এবং পীড়ন না করা, তাদের খাদ্যপানীয় ও বিশ্রামের দিকে খেয়াল রাখা, কাউকে অহিতকর উপদেশ না দেওয়া, কারো গোপন তথ্য প্রকাশ না করা, রাষ্ট্রবিরোধী কাজ, চোরাই জিনিসের খরিদ্দারি, ভেজাল ব্যবসা, ইত্যাদিতে যুক্ত না থাকা, ইত্যাদি। মিথ্যা উপদেশ কাউকে দেওয়া উচিত নয়; কারও গোপনীয়তা প্রকাশ করা উচিত নয়। জৈন আচার ভূমি, জল, আগুন, বায়ু, গাছপালা, এমনকি কীট-পতঙ্গকেও রক্ষার কথা বলে। সাধারণভাবে যাদের জড় পদার্থ হিসেবে ধরা হয়, তাদের সাথেও খারাপ ব্যবহার না করা, ব্যভিচার বা পতিতাবৃত্তি না করা, জল ও খাবার ঠিকমত দেখে খাওয়া, চলার সময় সম্মুখে ভূমির উপর দৃষ্টি রেখে পদক্ষেপ করা, ক্রোধ, লোভ, অপবাদ, পরনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা ত্যাগ করা – এভাবে জৈন আচরণবিধির সব দিকগুলিই মানুষে মানুষে এনং মানুষে পরিবেশে বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে যে অত্যন্ত সহায়ক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বঙ্গদেশের জৈন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

১। বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল (গবেষণা গ্রন্থ)

লেখিকা – ডঃ লতা বোথরা

প্রাপ্তিস্থান – বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ৫এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩

২। মনে রেখো (স্থানীয় ইতিহাসনির্ভর কাব্যগ্রন্থ)

লেখক – অরুণ কুমার মাজি

প্রাপ্তিস্থান – শ্রী অভিনন্দন মাজী, পুঁচড়া, পশ্চিম বর্ধমান

৩। সরাকদের বিশ্বস্ততার কাহিনী (ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী)

লেখক – মুনি শীলপ্রভ মহারাজ

প্রাপ্তিস্থান – প্রবীর কুমার সিং, গ্রাম ও ডাকঘর – ঝাঁপড়া, জেলা - পুরুলিয়া